# জুজু

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

জুজু
মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

# কুপিত-পিশাচ

সাদিয়ার বান্ধবীরা একেকটা ভিতুর ডিম। নানান এলাকার নানান গল্প শুনে সেই গল্পকে বাস্তব মনে করে ভয় পায়। যেমন এই সেদিন একটা গল্প শুনল, তাদের স্কুলে যাওয়ার পথের বটগাছটাতে নাকি একটা বাচ্চা মেয়ে ফাঁস লাগিয়ে মারা গেছে। এবং সেই মেয়ের আত্মাটা নাকি এখনো সেখান দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক মানুষকে ভয় দেখায়। সেই থেকে সাদিয়ার বান্ধবীরা সেই বটগাছের পাশ দিয়ে যায় না। গেলেও দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে যায়। সাদিয়া এসব দেখে খিল খিল করে হাঁসে। আর বলে, তোদের কতবার করে বলবো ভূত বলে কিছু নেই, তবুও কেন যে ভয় পাস।

তিন্নি, মৌ, জয়া, সাদিয়া, এরা চার বান্ধবী। কেবল ক্লাস সিক্সে পড়ে। চারজনে নাচতে নাচতে স্কুলে যায়। আবার গাইতে গাইতে স্কুল থেকে ফিরে আসে। শৈশব যে কতোটা রঙিন হতে পারে এই চারজনকে দেখলে সেটা বোঝা যায়।
মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে সাদিয়া একটু বড় এবং বুদ্ধিমতী। আর বাকি তিনজন একটু বোকা স্বভাবের।

সেদিন স্কুলের টিফিনের সময় একটা আলোচনা সবার কানে শোনা যেতে লাগল। আলোচনাটা এইরকম,
তাদের স্কুল থেকে অনেক দূরে পুরনো একটা ফ্যাক্টরি আছে। সেটা অনেক আগে চালু ছিল। কোন একটা কারণে এখন সেটা পরিত্যক্ত হয়ে আছে। ইদানীং কয়েকজন লোক একটা আজব জিনিস খেয়াল করছে। ফ্যাক্টরির পাশের জমিগুলোতে মনে হচ্ছে কোন অদৃশ্য অবয়ব ঘুরে বেড়ায়।
অবয়ব-গুলে যেদিকে যায় সেদিকে ছোটখাটো একটা টর্নেডোর মতো ঝড়ের সৃষ্টি হয়। জমিতে পরে থাকে খড়গুলো ঘুরপাক খেতে খেতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। অবশ্যই এর পেছনে কোন একটা অদৃশ্য কিছুর হাত আছে।

তিন্নির দাদি অনেক ভূতের গল্প জানে। উনার গল্প শুনে মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না। সে কি ভয়। গা হিম হয়ে আসে।
তিন্নি তার দাদির কাছে সেই অদৃশ্য অবয়বটার কথা জিজ্ঞাস করল। তার দাদি ঘটনাগুলো শুনে চিন্তাভাবনা করে বলল, ওইটারে কুপিত-পিশাচ কয়। পিশাচটা বাতাসের মতো। বাতাসে ভাইসা বেড়ায়। কোনদিন কাউরে ভয় দেখায় না। তয় মানুষের অমঙ্গল করে। মানুষের গায়েবি ক্ষতি করে। কোনদিন অই পিশাচের সামনে পরলে বেশি কইরা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়বি। নাহইলে কিন্তু এমন ক্ষতি কইরা দিবো, সারাজীবনেও তার মাশুল দিতে পারবি না।
কথাগুলো শুনে তিন্নির গলা শুকিয়ে যায়। তার মানে কি ফ্যাক্টরির পাশের জমিগুলোতে অই কুপিত-পিশাচেরা ঘুরে বেড়ায়?

চার বান্ধবী চিন্তা করল একদিন তারা সেই পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরিটার কাছে যাবে। ব্যাপারটা তাদের

পরিবারের কাউকেই জানানো হবে না। তাদের লিডার সাদিয়া। সাদিয়া দেখতে চায় সেই কুপিত -পিশাচটাকে। তিন্নি, মৌ আর জয়ার যাওয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু শর্ত হলো, কেউ কাউকে ছেরে যেতে পারবে না। সবাইকে একসাথে থাকতে হবে। যাতে পিশাচটা কাউকে আক্রমণ করতে না পারে।

একদিন দুপুরবেলা চারজন মিলে রওনা হল সেই ফ্যাক্টরিটার ওইখানে। আশেপাশে ধু ধু পতিত জমি। কোন গাছপালা নেই। জমিগুলাতেও বিগত কয়েক বছর ধরে চাষাবাদ হয় না। উত্তর দিকে তাকালে দেখা যায় বিশাল বড় দেয়াল। দেয়ালের অপর পাশে ফ্যাক্টরি। দেয়ালের দৃষ্টি টপকে কয়েকটা কন্টেইনারের দেখা পাওয়া যায়।

তাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। আরো আধ-মাইল পরেই সেই দেয়ালের কাছে যাওয়া যাবে। এবং দেয়ালের পাশের জমিগুলোতেই নাকি কুপিত-পিশাচেরা ঘুরে বেড়ায়। তিন্নির ভয় পাওয়া আরাম্ব করে দিল। কারণ সূর্য ক্রমাগতই পশ্চিম দিকে হেলে যাচ্ছে। সূর্যের আলোর তেজ ক্রমাগত কমে আসছে। সূর্যের আলো দূরে থাকা ফ্যাক্টরির সেই কন্টেইনারের উপর পতিত হয়ে এক বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করছে।
যদিও তিন্নি ভয় পাচ্ছে তবুও তার মধ্যে পিশাচটাকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে।

সাদিয়া মেয়েটা কেন জানি এসব অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। তার ধারণা, যেই জিনিস আমরা নিজের চোখে দেখিনি, সেই জিনিস আবার আমাদের ভয় দেখায় কিভাবে?
সাদিয়া ভূতের গল্প পড়ে। দেখে মনে হয়, কোন কমেডি গল্প পড়ছে।
সেদিন সাদিয়া একটা গল্প পড়ে খিল খিল করে অনেক্ষন হাসল। কারণ, শাঁকচুন্নিরা নাকি মানুষের রক্ত চুষে খায়। তাহলে ওরা টয়লেট করে কোথায়? আবার, তাদের গায়ে যে কাপড় থাকে, অগুলা কোন মার্কেট থেকে কিনে? ওদের কি আলাদা কোন দোকানপাট আছে?
এই প্রশ্নের কোন উত্তর সাদিয়ার বান্ধবীরা দিতে পারে না।

চার বান্ধবীর মধ্যে সবকিছুতে মিল থাকলেও অমিলটা শুধুমাত্র এইখানেই। সাদিয়া ভূতে বিশ্বাস করে না। এই কারণেই সাদিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব হয় অনেকবার।
মৌ মাঝে মাঝে বলে, যেদিন গেছো ভূতের সামনে পড়বি, তখন বুঝবি কেমন লাগে। সেদিন আমার দাদীর সামনে পড়েছিলো। সারা বেলা অজ্ঞান হয়েছিলো।
সাদিয়া বলে, ডাকিস তোর গেছো আংকেলকে। দেখি কিভাবে ভয় দেখায়।
সাদিয়ার কথা শুনে মৌ-য়ের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সাদিয়া কোনভাবেই বিশ্বাস করতে চায় না ভূত বলে কিছু আছে। কিন্তু ভূত আসলেই আছে। তা না হলে সেদিন রুমা নামের শান্তশিষ্ট মেয়েটা ওইরকম পাগলের মতো ব্যাবহার করলো কেন? আর অইভাবে মানুষকে বিশ্রীভাবে গালি দিল কেন? ভুতটাকে বোতল বন্দি করার পর রুমা মেয়েটা দিব্বি ভালো হয়ে গেল, যেন কিছুই হয় নি, সবকিছু স্বাভাবিক। ভূত ছাড়া আর কে এমন করতে পারে?

এতক্ষণে চারজন ফ্যাক্টরির কাছেই চলে এসেছে। সূর্যের আলোর আভা একটু একটু দেখা যায়। এখন গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণের আকাশে একটু একটু মেঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। বৃষ্টি হবে কি? হতেও পারে।
আশেপাশে সবকিছু স্তব্ধ। কোন মানুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্যাক্টরির অপর পাশে একটা রাস্তা আছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা বাস-ট্রাক ছুটে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তাও নেই। জমিগুলোতে ঘাস জন্মেছে প্রচুর। মাঝে মাঝে লোকেরা এখানে এসে বস্তা বোঝাই করে ঘাস কেটে নিয়ে যায়।

আধা ঘণ্টা বসে থাকার পরেও কোন ধরনের অলৌকিক কিছু লক্ষ করল না তারা। এদিকে বেলা গড়িয়ে আসছে। দক্ষিণের আকাশে থাকা মেঘরাশিগুলো ক্রমাগতই উত্তরের দিকে এগিয়ে আসছে। বৃষ্টিও নামতে পারে। কিন্তু এখনো তারা সেই কুপিত-পিশাচের দেখা পেল না।
সাদিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, পিশাচটা কি আমাদের দেখে ভয় পেল নাকি রে?
বাকি তিনজনের মুখে কোন কথা নেই। কোথায় গেল পিশাচটা? এখান দিয়েই তো ঘোরাঘুরি করে।

আর কিছুক্ষণ থাকার পরে চারজন সত্যিই অনেক বিরক্ত হয়ে গেল। আজকে মনে হয় ওইটার দেখা পাওয়া যাবে না। মন খারাপ করে চারজন চলে যেতে আরাম্ব করল। কিন্তু যেতে গিয়েও থেমে যেতে হল তাদের। তারা লক্ষ করল বাতাস আরাম্ব হয়েছে। রাশি রাশি মেঘ দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসতে লাগল। বৃষ্টি নামবে হয়তো। দৌড় দিতে গিয়েও দৌড় দিল না কেউ। কারণ, তাদের ঠিক পেছনে কুপিত-পিশাচটা। চারজনে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রবল একটা ঘূর্ণিবায়ু সবকিছু ঘুড়িয়ে উপরের দিকে তুলে নিচ্ছে। মরা খড়কুটাগুলো সেই ঘূর্ণনের ফলে উপরের দিকে উঠে গিয়ে অন্য জায়গায় ছিটকে পড়ছে।

তিন্নি চিৎকার দিয়ে উঠল। সাদিয়া বাদে বাকি তিনজনে সরে গেল। সাদিয়া পেছন দিয়ে তাকিয়ে দেখল তার বান্ধবীরা সব দৌড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। সাদিয়া তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, ঘূর্ণিবায়ুটা তার পায়ের খুব কাছেই। এটাকেই বলে কুপিত-পিশাচ?
সাদিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর তিনজনকে ডাক দিয়ে বলল, তোরা একটা আস্ত গাধা। এই সামান্য জিনিসকে তোরা এতোটা ভয় পেলি? তোরা যেটাকে পিশাচ বলে ভয় পাচ্ছিস আদতে সেটা কিছুই না।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার বাতাস কমে আসলো। তখন পিশাচটাও গায়েব হয়ে গেল। তিন্নিরা যেন এইবার একটু সাহস পেল। তিনজন সাদিয়ার কাছে যাওয়ার পর সাদিয়া ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলল,
আলো যেরকম প্রতিফলিত হয় ঠিক সেরকমভাবে বাতাস-ও দেয়ালে প্রতিফলিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস ফ্যাক্টরির দেয়ালে লেগে প্রতিফলিত হয়ে আবার বিপরীত দিকে ফিরে আসে। এই বাতাসটা আপতিত হওয়া আর প্রতিফলিত হওয়ার মাঝাখানের স্থানটুকুতে একটা

ঘূর্ণন বলের সৃষ্টি হয়। আর সেটাকেই তোরা পিশাচ বলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কতবার তোদের বলি, এসব ভূতের গল্প বাদ দিয়ে বেশি বেশি বিজ্ঞান বই পড়বি। তাহলে বুঝতি এসব হওয়ার কারণ।

তিন্নি বলল, তাহলে আমার দাদু যে সেদিন বলল, এইটারে কুপিত-পিশাচ বলে, ওইটা কোন সাধারণ জিনিস না। তাহলে কি এগুলা সব মিথ্যা?
সাদিয়া বলল, তোর দাদু কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে শুনি?
- ক খ বলতে পারে। কিন্তু কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে সেটা যানি না।
- বিজ্ঞানের ব পর্যন্ত মনে হয় তোর দাদু পড়তে পারে নি। তাই হয়তো বিষয়টা জানে না।
তিন্নিসহ বাকি দুজনের মুখমণ্ডল চুপসে গেল। সাদিয়া বলল, যাকগে। এখানে এসে যে এক্কেবারেই লস হয়েছে তা মোটেই না। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

সেদিন সাদিয়ারা চলে আসল। তিন্নিসহ সবাই বিষয়টা বুঝতে পারল। আসলে এতক্ষণ যাকে তারা ভয় পাচ্ছিল আসলে সেটা আদৌ কিছুই না। কালকে স্কুলে গিয়ে সবাইকে বিষয়টা বলতে হবে। বিশেষ করে তিন্নির দাদীকে। তিনি যদিও বাতাসের প্রতিফলন জিনিসটা বুঝতে পারবেন কিনা সেটা কেউ জানে না। কিন্তু বলতে হবে, ওইসব পিশাচ টিশাচ বলে কিছু হয় না।

এই ঘটনার পর আরো দুই দিন পার হয়ে গেল। এই দুই দিনে সেই কুপিত-পিশাচ নিয়ে কোন ধরনের কথাবার্তা হলো না। কিন্তু তার পরের দিনগুলো থেকে ঘটনাগুলো পুরোটাই বদলে যেতে লাগল। স্কুলে একদিন মৌ আর জয়া আর সাদিয়া একই বেঞ্চে বসেছে। সবকিছু ঠিকভাবেই চলছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে কিছুক্ষণ পর সাদিয়া বলল, আমার খুব খারাপ লাগছে রে। প্রচণ্ড মাথা ঘুড়াচ্ছে। জয়া বলল, পানি খা, ঠিক হয়ে যাবে। সাদিয়া পানি খেয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা কোনভাবেই কমছে না।
সাদিয়া দৌড়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেল। সাদিয়ার পেছনে মৌ আর জয়াও গেল। সাদিয়া ওয়াশরুমে গিয়ে হর হর করে বেসিনে বমি করে দিল।
সেদিন সাদিয়া আর ক্লাস করতে পারল না। বাসায় চলে আসল। জয়া-ই বাড়িতে পৌঁছে দিলো। জয়ার বাসা সাদিয়ার বাসার কাছেই। সাদিয়া পথ দিয়ে আসার সময় বার বার বলছিলো, আমার অনেক মাথা ব্যথা করছে রে। জয়া বলল, সারাক্ষণ বইয়ের পিচ্চি পিচ্চি লেখার দিকে তাকিয়ে থাকিস। তাই তো মাথা ব্যথা করে। চোখের সাথে মাথার কানেকশন আছে। কিছুদিন বই পড়া কমিয়ে আমাদের সাথে খেলাধুলায় সময় কাঁটা। এসব মাথা ব্যথা কিচ্ছু থাকবে না। বুঝলি।
জয়ার কথাগুলো সাদিয়া চুপ করে শুনছিলো। ওর কথাগুলো সত্যও হতে পারে। ইদানীং সাদিয়া বইও পরছে প্রচুর। চোখের পাওয়ার আসতে পারে। কিন্তু তবুও সাদিয়া কেন জানি একটু একটু ভয় পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একটা খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে তার সাথে। হটাৎ করে এমন ধারণা করার কারণটা পুরোই অমূলক। কিন্তু তবুও সাদিয়া ভয় পাচ্ছে। বুকটা ধড়ফড় করছে।

বিকালে সাদিয়া ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বলল, মাথায় প্রচুর প্রেশার। কিছুদিন রেস্ট

নিতে হবে। রেস্ট নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু সব ঠিক হওয়ার কথা হলেও কিছুই সে রাতে ঠিক হল না। রাতের বেলা সাদিয়ার বমির পরিমান বাড়তে লাগল। একসময় বমির সাথে রক্ত পরা আরাম্ব করল। টকটকে লাল রক্ত। সাদিয়ার ফ্যামিলির সবাই প্রচন্ড ভয় পাচ্ছে। সাদিয়ার এরকম হওয়ার পেছনে কোন কারণ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। আগেও সাদিয়ার এরকম কখনোই হয় নি।

সে রাতে সাদিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হল। স্যালাইন দেওয়া হল। মাথার যন্ত্রণায় সাদিয়া পাগলের মতো করতে লাগল। বাবা-মা দুজনে শান্ত করার চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না। একসময় ডাক্তার বাধ্য হয়েই ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রাখল।
যতক্ষন অজ্ঞান থাকে ততক্ষন ভালোই থাকে। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার পর আবার একই অবস্থা। অবস্থা কোনভাবেই ভালোর দিকে যাচ্ছে না। এখনো বমির সাথে তাজা রক্ত আসছে। ডাক্তার বলেছে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি রক্ত পরা না বন্ধ হয়, তাহলে রক্ত দেওয়া লাগবে।

এভাবে আরো তিন দিন পার হয়ে গেল। সাদিয়ার অবস্থার একটুও উন্নতি হল না। রক্ত দেওয়া হয়েছিলো। ডাক্তার বলেছে পেটে একটা ক্ষত হয়েছে। সেখান থেকে রক্ত আসছে। অপারেশন করা লাগতে পারে। আর মাথা ব্যাথার কারণ এখনো জানা যায় নি। অবস্থা খুব ক্রিটিকাল। মাঝে মাঝে পাগলের মতো ব্যাবহার করে এখন। আবোলতাবোল বলে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পরদিন শেষরাতে সাদিয়া মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা গেল। মৃত্যুটা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। মরার সময় সাদিয়ার ছটফটানি-টা অনেকেই দেখে ভয় পেয়েছে। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মুখ দিয়া গর গর আওয়াজ হচ্ছিল। হাত পা কুচকে যাচ্ছিল। সাদিয়ার মা এসব দেখে সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়েছিল।

তিন্নি, মৌ আর জয়া সাদিয়ার মৃত্যুর খবরটা যেন কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এরকম একটা সাহসী মেয়ে। কয়দিন আগেও চুলের বেণী দুলিয়ে ওদের সাথে খেলাধুলা করল। সেই হাসিখুশি মেয়েটা নাকি আজকে মরে গেল।

সাদিয়াকে যেদিন দাফন করা হচ্ছিল, সেদিন আবার সেই ঘুর্ণিবায়ুটা আশেপাশে ঘুরছিলো। মাটিতে পরে থাকা পাতাগুলো ঘুড়তে ঘুড়তে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা কেউ খেয়াল না করলেও তিন্নি খেয়াল করল। কুপিত-পিশাচ। কই… আশেপাশে তো কোথাও কোন দেয়াল নেই। আবার বাতাসও তো নেই খুব একটা। তখনি হটাৎ তিন্নির দাদীর সেই পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল,
"ওইটারে কুপিত-পিশাচ কয়। পিশাচটা বাতাসের মতো। বাতাসে ভাইসা বেড়ায়। কোনদিন কাউরে ভয় দেখায় না। তয় মানুষের অমঙ্গল করে। মানুষের গায়েবি ক্ষতি করে।"

১৪ই মার্চ ২০২৪

## ছাগল

তমার মা ছোটবেলায় মারা যায় কলেরায়। সেই থেকে তমাকে আদরযত্ন করে তার দাদী। দাদী মানুষটা খুব ভালো। তমার দাদা মারা যাওয়ার সময় তার দাদীকে নাকি বলেছিলো, আমার মেয়েডারে আল্লায় নিয়া গেছে। কিন্তু আমার নাতনীডা তো আছে। তুই আমার নাতনীডারে দেইখা রাখবি। অর কিছু হইতে দিবি না।
সেই থেকে তমার দাদী তমাকে প্রচুর পরিমান ভালোবাসে। তমা বয়সে এখন সবে এগারো। দাদীর একমাত্র নয়নের মণি হচ্ছে তমা। সে স্কুলে গেলে টিফিনের সব রান্নাবান্না দাদী-ই করে। তমাকে বলতে গেলে চুলায় হাতই লাগাতে দেয় না। মাঝে মাঝে তমা তাই বলে,
- এখন রান্নাবান্না না শিখলে জামাই বাড়ি গিয়ে রান্না করবো কিভাবে?
- হ...। এখন রান্না কইরা চেহাড়াডা কালা বানাও। তহন জামাইয়ে পছন্দই করবে না। তহন খুব ভালা হবো। তরে রান্না শিখানো লাগবে না। তুই একাই পারবি।
আসলেও তমা রান্না করতে পারে ভালোই। সে বছর তমার দাদীর জ্বর আসলে তমাই রান্না করে খিলিয়েছে দাদীকে। দাদী অনেক রাগ করলেও তমা সেটা উপেক্ষা করে রান্না করতে চলে গেল চুলায়।

সেদিন বিকেলে তমার দাদী রান্না করছিলো চুলায়। তমার স্কুল কেবল ছুটি হল। বাইরে বাতাস। কিছুক্ষনের মধ্যেই মনে হয় বৃষ্টি নামবে। আস্তে আস্তে পরিবেশটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তমার দাদী তমাকে বলল, পুবের ক্ষেতে ছাগলডা বাইন্দা রাইখা আইছি। ছাগলডা একটু নিয়ায়। বৃষ্টি নামবো মনে হয় হারা রাইতের নামে।

তমা ব্যাগটা রেখে ছাগল আনতে গেল। ক্ষেতে প্রচুর বাতাস। মনে হচ্ছে তমা এখনি উড়ে কোথাও ছিটকে পড়ে যাবে। পরিবেশটা আরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনি বেলা ডুবে যাবে। ক্ষেতের আশেপাশে কোন মানুষের চিহ্ন নেই। আশেপাশে কারো গরুছাগল দেখা যাচ্ছে না। সবারটাই সবাই যার যার বাড়িতে নিয়ে গেছে। তমা এদিক ওদিক তাকিয়েও কোন ছাগলের দেখা পেল না। এই অন্ধকার পরিবেশে তমা কোথায় খুঁজবে ছাগলকে?
হঠাৎ তমা খেয়াল করল, সামনে একটা ছাগলের ডাক শোনা যাচ্ছে। ছাগলটা চিৎকার করছে। তমা আর এক মুহূর্তের জন্যও সেখানে দাঁড়াল না। ছাগলের ডাকের উৎসের দিকে দৌড় দিলো। তমা খেয়াল করলো, অনেক দূরে ছাগলটা দেখা যাচ্ছে। তমা দৌড়াচ্ছে। আরো দৌড়াচ্ছে। অনেক্ষানি যাওয়ার পর তমা একটা জিনিস খেয়াল করল, সে যতই দৌড়াচ্ছে ছাগলটাও আরো দৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। থামার কোন লক্ষনই যেন নেই। বাতাসের যে অবস্থা, এতে ছাগলটা এরকম পাগলের মতো দৌড়ানোটাই স্বাভাবিক।

সামনে একটা খাল। খালে এখন একটু একটু পানি আছে। তমা আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। খালের সামনে এসে ছাগলটা কিছুক্ষন স্থির হয়ে রইল। তমা যখন ছাগলটার আরো কাছে গেল। তখন ঘটল একটা আজব ঘটনা। ছাগল এমনিতে পানিকে ভয় পায়। হাজারবার চেষ্টা করেও যেই ছাগলকে পানিতে নামানো যায় না। সেই ছাগলটা লাফ দিয়ে খালের পানিতে নেমে

পড়ল।

এরপর তমা যা দেখল সেটা দেখে সে এক মুহুর্তের জন্যও সেখানে দাঁড়াল না। খালের পাড় থেকে উঠে সোজা বাড়ির দিকে দৌড়ানো আরাম্ব করল। কোন দোয়া দরুদ মনে পরছে না। অন্ধকার কিছুটা কমে এসেছে। আকাশ একটু একটু পরিস্কার হচ্ছে। বাড়ি গিয়ে তমা ধপাস করে সিরিতে বসে পড়ল। তমাকে হাঁপিয়ে আসতে দেখে তার দাদী এগিয়ে এসে বলল, কিরে! অবা হাঁপাইতাছত ক্যা? কি হইছে? কি দেখছত?
তমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। দাদী এক গ্লাস পানি এনে দিলে তমা সেটা পুরোটাই খেল। তারপর দেখল, আম গাছের সাথে তাদের ছাগলটা বাঁধা।
তমা অবাক হয়ে বলল, দাদী! ছাগল? ছাগলটা কখন আসল?
- তুই যাওয়ার আগেই একাই বাইত্তে ছুইটা আইছে। আমি খেয়াল করি নাই। তুই যাওয়ার পরেই দেহি, ছাগলটা ঘড়ে ভুসি খাইতাছে।
তমা কিছুক্ষন চোখ বড় বড় করে ছাগলটার দিকে তাকিয়ে রইল। দাদী জিজ্ঞাস করল, তুই অবা হাঁপাইয়া আইছত ক্যা কইলি না তো? সে দাদীকে সব ঘটনা খুলে বলল। সেইটা শুনে দাদী কিছুক্ষন থ হয়ে রইল।

ছাগলটা যখন খালে নামল তমা তখন খালের পাড়ে। তমাও ছাগলের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল। ছাগলটা হটাৎ করে তমার দিকে ঘুড়ে দাঁড়াল এবং তার সামনের দুই পা দিয়ে তমাকে পানি ছিটিয়ে দেওয়া আরাম্ব করল। তমা আরেকটু পিছিয়ে যেতেই খেয়াল করল, ছাগলটা তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে খিল খিল করে হাঁসছে। সেটা দেখে তমার আর মাথা ঠিক ছিল না। এক দৌড়ে চলে আসে বাড়িতে।

২৮শে মার্চ ২০২৪

**জঙ্গল**

সেদিন বিকেলবেলা খবর আসলো, আমাদের বন্ধু রাজিবের ছোটবোনের বিয়ে। অনেক বড় আয়োজন। বন্ধু বলেছে, যে করেই হোক, যেতেই হবে। এরকম একটা সুন্দর সময় বন্ধুদের ছাড়া না কাঁটালে ব্যাপারটা জমে না। তাই আমরা তিন বন্ধু, আমি, মাসুদ আর সোহাগ মিলে চিন্তা করলাম কালকে সকালের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবো। সেদিন রাতেই আমাদের ব্যাগপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে দিলাম। ক্যামেরা, চার্জার, কিছু জামাকাপড় ইত্যাদি তুলে রাখলাম সেদিনই।

আমরা তিন বন্ধু ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় রাজিবও আমাদের অনেক ভালো বন্ধু ছিলো। কিন্তু তার বাবা তাদের ফ্যামিলি নিয়ে অন্য শহরে চলে যায়। এখন মাঝে মাঝে ফোনে আলাপ হয়। দেখা তেমন একটা হয় না। তাই এইবার রাজিবের বোনের বিয়ের দাওয়াতটা আমরা কেউ মিস করতে চাই না। মাসুদের গাড়িতে আমরা যাবো। ছেলেটা ভালোই ড্রাইভ করে। যেতে আনুমানিক তিন ঘন্টার মতো লাগতে পারে। আড্ডা দিতে দিতেই তিন ঘন্টা পার হয়ে যাবে।

সকাল বেলা খেয়েদেয়ে আমরা বের হয়ে পরলাম। শীতের সকাল। কুয়াশাটা এখনো বেশি কাঁটে নি। চারদিকে তাকালে এখনো ধু ধু সাদা। এই আবহাওয়ায় গাড়ি চালাতে হবে আস্তে আস্তে। তিন ঘন্টার জায়গায় ৪-৫ ঘন্টাও লাগতে পারে। বিসমিল্লাহ্ বলে মাসুদ গাড়ি স্টার্ট করল। মাসুদ আর সোহাগ একসাথে সামনে বসেছে। আর আমি একা পেছনে। একটু পর পর হর্ণ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ। গাড়িতে বন্ধুরা মিলে নানান ধরনের কথাবার্তা বলছি আমরা।
সোহাগ একসময় বলে উঠল, বুঝ্ছিস ছেলেদের জীবনটা কতো ঝামেলার।
- কেন? ঝামেলার আবার কী দেখলি?
- রাজিবের ছোট বোন রাজিয়া। এই দু দিন আগেই পিচ্চি আছিলো। মনে আছে?
- হ্যা। তো?
- আজকে নাকি তার বিয়ে? আর এদিকে আমরা ছেলেরা? এখনো আমাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। আর বিয়ে তো দূরের কথা। বাবা-মায়েরা এখনো আমাদের শিশুই মনে করে বুঝ্ছিস?
আমি বললাম, এতোই যখন চিন্তা হচ্ছে তাহলে বিয়েটা করছিস না কেন? তোকে আটকিয়ে রেখেছে কে?
রাজিবের মনটা এক্কেবারে চুপসে গেল। আমি আবার বললাম, কাউকে পছন্দ করে থাকলে বল, আমরা ব্যাবস্থা করে দিতে পারি।
- আর পছন্দ। তেমন কেউ নেই রে।
- আহারে! কী কষ্ট কী কষ্ট...
- এমন করছিস কেন? তর কী একটা মুরোদ হবে?

এভাবে অনেক্ষন আলাপ হলো আমাদের মধ্যে। কুয়াশার পরিমান আস্তে আস্তে কমছে। যাক!

একটু ভালোই গতিতে গাড়ি চালানো যাবে। তিন বন্ধু গান গাইতে গাইতে এগোতে লাগলাম। সবকিছু ঠিকভাবেই চলছিলো। কিন্তু একটু পরেই হলো ঝামেলাটা। সামনে নাকি লম্বা জ্যাম। জ্যামের কারন জানতে পেরে বুঝতে পারলাম রাস্তার মাঝখানে দুইটা ট্রাকের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। সবকিছু স্বাভাবিক হতে নাকি অনেক সময় লাগবে।
এদিকে রাজিব বার বার ফোন করে বলছে, আর কতোক্ষন লাগবে রে? তারাতারি আয়। তোদের জন্য অনেক্ষন ধরে অপেক্ষা করছি।
আরে! চিন্তা করিস না। রাস্তায় জ্যাম। সামনে ট্রাক অ্যাকসিডেন্ট করেছে। আসতে একটু দেরি হতে পারে। তুই চিন্তা করিস না।
- দুপুর হয়ে এলো। একটু পরে অতীথিদের খাওয়ানো হবে। ভেবেছিলাম তোদের সাথে কয়েকটা পিক তুলবো। তা মনে হয় এইবার হবে না।
- আরে পাগল। তুই চিন্তা করিস না তো। আমরা ঠিক সময়ই এসে যাবো।

মাসুদ গাড়ি ঘুড়িয়ে ফেলল। আমরা বললাম, কী রে, কোথায় যাবি?
মাসুদ সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, শর্টকাট। এই রাস্তা দিয়ে গেলে আজকে রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমার একটা রাস্তা জানা আছে। সেখান দিয়ে যাবো।
আমি বললাম, ভালো তো। চল তাহলে। এই জ্যামের মধ্যে বসে থেকে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়াটাই ভালো।
সোহাগ বলল, মুভিতে দেখেছি শর্টকাট রাস্তাগুলো সবসময় ভয়ানক হয়। আবার যেন মুভির সাথে আমাদের মিলে না যায়।
মাসুদ সোহাগকে থামিয়ে দিয়ে বলল, যত্তসব ফালতু কথা। মুভির সাথে বাস্তবের তুলনা করবি না। মুভির ঘটনাগুলো হতে হয় জটিল। জটিল না হলে সেটা গল্প হয় না। কিন্তু মানুষের বাস্তব ঘটনাগুলো হয় সরল। বুঝেছিস?
আমরা মাথা নাড়ালাম।

মাসুদ ড্রাইভ করতে করতে আমাদেরকে একটা জঙ্গলের সামনে নিয়ে আসলো। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চিকন রাস্তা। মাসুদ বলল, এই রাস্তা দিয়ে গেলে অন্তত আমাদের দু ঘন্টা সময় বেঁচে যেত।
আমি বললাম, তুই এই রাস্তা চিনলি কিভাবে?
- কিভাবে আবার? ম্যাপ দেখে।
ফোনের লোকেশন বের করে দেখতে পারলাম সামনের জঙ্গলটাকে। বিশাল বড় জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ছত্রিশ কিলোমিটার লম্বা জঙ্গলের রাস্তাটা। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এতো ঘণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতো লম্বা রাস্তা। ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগতে লাগল।
মাসুদ গাড়ি স্টার্ট করল। গাড়িটা জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করল। যাক। রাস্তাটা খারাপ না। মাটির রাস্তা। চারদিকে ঘণ গাছপালা। সুর্যের আলো বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ির স্পিড ভালোই ছিলো। তিনজনে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছি। মাসুদ হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করায় আমরা

একটু চমকে গেলাম। গাড়ির পাশে একটা পাগল মতো লোক দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাসটা নামানোর পরে পাগল লোকটা বলল, এইখানে কী চাই? এই রাস্তায় এসেছেন কেন?
- বিয়ের দাওয়াতে যাবো সবাই। আপনিও চলুন আমাদের সাথে। একসাথে মজা করা যাবে।
কথাটা বলার পর সবাই হো হো করে হেঁসে দিলাম।
লোকটা বলল, হাঁসি পাচ্ছে? আমার কথা শুনে হাঁসি পাচ্ছে?
- বলি রাস্তাটা কি আপনার? যে আপনাকে জিজ্ঞাস করে এখানে ঢুকতে হবে?
লোকটা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে বলল, সবাই মরবে এই রাস্তা দিয়ে গেলে। অনেক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে এই জঙ্গলটাতে মানুষ খেকোর আগমন হয়েছে। জবাই করে নাকি মানুষের মাংস খায়।
লোকটার কথা শুনে মাসুদ বলল, ভালোই তো জোক্স বলতে পারেন আপনি। আমাদের এভাবে ভয় দেখালেই কি আমরা চলে যাবো? যত্তসব পাগল কোথাকার। কোথা থেকে যে আসে এগুলা। গিয়ে রাস্তায় বসে ভিক্ষা করগে। এই জঙ্গলে কী?
এই কথা বলে মাসুদ গাড়িটা স্টার্ট করে রওনা হল। পাগল মতোন লোকটা তাদের গাড়ির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে আতংকের একটা ছাপ দেখা গেল। আমি খোয়াল করলাম লোকটা পেছন থেকে এখনো আমাদের ডাকছে। নাহ্! লোকটার সাথে এরকম খারাপ ব্যাবহার করা ঠিক হয় নি। ভালোভাবে বুঝালেই হত।

সবাই গাড়িতে গান শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। লোকটার কথা ভুল প্রমানিত হল। এতো সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ না দেখলে তারা অনেক কিছুই মিস করত। এখান দিয়ে এসে ভালোই হয়েছে। আমরা গানের সাথে তাল মিলিয়ে গলা ছেরে গান করছি।

"আমি এসেছি আবার তোমার কাছে ফিরে,
হাতটা ধরেছি যেতে দেব না দুরে।
বুকের মাঝে আগলে লাগতে চাই তোমাকে..."

গানের তালে তালে আর বাইরের প্রকৃতির মোহে যেন কিছুক্ষনের জন্য সবাই অন্ধ হয়ে গেছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষন পরে একটা জিনিস খেয়াল করে আমার কেমন যেন লাগতে লাগল। আমি খেয়াল করলাম, আমাদের চারপাশের জঙ্গলটা আস্তে আস্তে কেমন জানি অন্ধকার হয়ে যেতে আরাম্ব করল। জঙ্গলের গাছপালা যেন ক্রমশ আরো ঘণ হয়ে যাচ্ছে। আকাশটাই ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না এখন। মাসুদকে বললাম, কিরে? এটা কোথায় আসলি? আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো?
মাসুদ বলল, দূর পাগল। চিন্তা করিস না। আমরা তো হাইওয়ে দিয়ে আসছি না। আসছি জঙ্গল দিয়ে। একটু ঝামেলা তো সহ্য করতেই হবে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ২ টা বাঁজে। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম, একটু নেটওয়ার্কও নেই। নো সার্ভিস লেখা। মাসুদকে বললাম, আসলেই লোকটার কথা মনে হয় আমাদের শোনার দরকার ছিলো রে। আমার বিষয়টা সুবিধার লাগছে না।

মাসুদ আয়নায় আমাকে দেখে বলল, অসুবিঝার কি পেলি?
- জঙ্গলটায় একটু নেটওয়ার্কও নেই। কারো সাথে যে যোগাযোগ করব, তার উপায়টা নেই।
- সালা। এই ঘণ জঙ্গলে টাওয়ার বসাবে কে? তোর শ্বশুর? এখানে কি জন্তু জানোয়াররা মোবাইল ইউজ করে? যে টাওয়ার লাগিয়ে তারা কথা বলবে? জঙ্গলেই যদি সব সুবিধা পাওয়া যেত তবে আর কেউ বড় বড় অট্টালিকা বানাতো না। এই জঙ্গলেই থাকত।
- হয়েছে হয়েছে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে আমার।

সোহাগ এতক্ষন কানে ইয়ারফোন দিয়ে গান শুনছিলো। গান শুনতে শুনতে হয়তো ঘুমিয়েও গিয়েছিলো। তাই ধরমর করে উঠে আমাদের জিজ্ঞেস করল? কিরে পৌছাই নি এখনো? সন্ধ্যা হয়ে গেছে নাকিরে? কয়টা বাঁজে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রায় তিনটা বেঁজে গেছে।
সোহাগ মোচর দিয়ে বলল, কিরে মাসুদ? বড্ড খুধা লেগেছে। বন্ধুর বাড়িতে খাবো বলে সকালে সামান্য নাস্তা করে এসেছিলাম। এখন পেটের অবস্থা কাহিল। আশেপাশে কোন হোটেল আছে নাকি রে? থামাস তো তখন।
মাসুদ বিরক্ত হয়ে বলল, হুম। সামনেই একটা হোটেল বানিয়ে রেখেছে তোর জন্য। এই জঙ্গলে তুই হোটেল পাবি কোথায় রে বাছা? এখানে কে আসে?
- কেউ যদি নাই আসতো তাহলে এই রাস্তাটা কিসের জন্য? কত সুন্দর ইট বিছানো আছে দেখছিস? এতো সুন্দর রাস্তা। কিন্তু একটা গাড়িও আসছে না। অইদিগের মেইন রাস্তায় তো জ্যাম। সেই উসিলায় তো কিছু গাড়ি এদিকে আসারও কথা ছিলো। নাকি এই সুন্দর রাস্তাটা কেউ চিনেই না। শুধু খালি তুই-ই চিনিস।
সোহাগের কথায় মাসুদের মুখেও চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল। আসলেই তো। এইরকম রাস্তা থাকতে কেউ কেন এই রাস্তা দিয়ে আসছে না?
পরক্ষনেই সে বলল, আসবে কিভাবে? অই পাগল লোকটা যদি ড্রাইভারদের অমন করে ভয় দেখায় তাহলে তো না আসাটাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ তো সত্যি মনে করে পালাবে।
মাসুদকে বললাম, হয়েছে বাদ দে। কয়টা বাঁজে দেখেছিস? বিয়ের দাওয়াত তো খেতেই পারলাম না। পরে গিয়ে খেতে হবে। সবাই পোলাও মাংস খেয়ে ঢেকুর তুলছে। আর আমাদের জন্য রেখেছে মাংসের হাড্ডি। গিয়ে সেগুলো চিবানো যাবে।
সোহাগ বলল, আমি আর তোদের কথাবার্তা শুনতে চাই না। আমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। যত তারাতারি পারিস মেইন রোড়ে যা। তাও অন্তত কিছু খেতে পারবো।
মাসুদ বলল, কেন? এখানেও কিছু খেতে পারবি। খাবার অনেক কিছুই আছে।
- কী আছে রে?
- অইযে বাইরে তাকিয়ে দেখ। গাছে যেন গোটা গোটা কিসের ফল। গাছে উঠে কয়েকটা পেরে আন। দেখ, খেতে পারিস কিনা।
- বাজে কথা বন্ধ করে তারাতারি গাড়ি চালা।
- পারছিনা তো। রাস্তা অতোটা ভালো না। দেখছিস না। কতোটা চিকন হয়ে আসছে রাস্তাটা।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি রাস্তাটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এদিকে বিকাল হয়ে

এসেছে। শীতের দিন। দিনের দৈর্ঘ ছোট। একটু পরে কুয়াশা পরবে। তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।
আচমকাই আমার বুকের ভেতরটা কেমন জানি ধক করে উঠল। ফোনের লোকেশনে দেখা যাচ্ছে, আরো অনেকটা পথ বাকি। সামনের দিকে এই গতিতে এগিয়ে যেতে আরো দেড় ঘন্টার মতো লাগতে পারে। মাসুদকে বললাম, তুই আমাদের কোথায় নিয়ে আসলি? এদিকে একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আশেপাশে একটা লোকজনের চেহারাও এতোক্ষনের ভাসে নি। কেউ থাকে না এদিকে। তার চেয়ে জ্যামে বসে থাকাটাও ভালো ছিলো। আর এতোক্ষনে জ্যামটাও মনে হয় ছেরে গেছে।
সোহাগ বলল, বলেছিলাম না? শর্টকার্ট রাস্তাগুলো সবসময় ভয়ংকর হয়। আমার কথায় তো তখন কেউ পাত্তা দিলো না। এখন বুঝো ঠেলা।
মাসুদ গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন গাড়ি ঘুড়িয়ে নেওয়াও বুদ্বিমানের কাজ হবে না। কারণ অলরেড়ি তারা অর্ধেক রাস্তার বেশি পার করে ফেলেছে।
মাসুদ আর কিছুক্ষন সামনে যাওয়ার পর আরেকটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পরে গেল। রাস্তা এতোটাই সরু হয়ে গেল যে, একটু বেশি গতিতে গেলেই আশেপাশের গাছের সাথে লেগে যাবে। আস্তে আস্তে কোনরকম পাশ কাটিয়ে গাড়ি গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাসুদ।

সোহাগ বিরক্ত হয়ে বলল, এই স্পিডে গাড়ি চালিয়ে গেলে সকাল হয়ে যাবে। তার চাইতে বরং চল ফিরে যাই। তোর শর্টকাটের নিকুচি করেছি।
মাসুদ বলল, এই রাস্তাটায় গাড়ি ঘুড়ানোটাও অসম্ভব। আর গাড়ি পিছিয়ে নেয়াটা আরো ঝুকিপুর্ণ। গাছের ডালগুলো দেখেছিস? কতো নিচে। এভাবে যেতে আজকে সারা রাত লেগে যাবে।
কী একটা বিপদের মধ্যে পড়লাম সবাই। না পারছি সামনের দিকে যেতে, আবার না পারছি পেছনের দিকে যেতে। আজকে আর আমাদের বন্ধুর বাসায় যাওয়া হবে না মনে হয়। ফোনে নেটওয়ার্ক নাই বলে রক্ষা। অলরেড়ি কমপক্ষে ১০০ বারের বেশি ফোন দিয়ে ফেলেছে রাজিব।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। আমাদের গাড়িটা ভয়ানকভাবে ফেঁসে গেল। মাসুদ না পারল পিছনের দিকে আর না পারল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। সামনের দিকের রাস্তাটা পুরোটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যা। আগে হয়তো রাস্তা ছিল। কিন্তু এখন সেই রাস্তাটা আর নেই। কোন কারণে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হয়তো এখান দিয়ে কেউ আসে না।
সোহাগ বলল, গুগল ম্যাপের প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ঠিক না। আগে হয়তো রাস্তা ছিলো। তাই ম্যাপে রাস্তা এড করেছে। এখন রাস্তাটা নেই। কিছু রাস্তাটা মোছার কথা কেউ ভাবেনি হয়তো।
মাসুদ বলল, এখন এখান থেকে বের হবি কিভাবে এই চিন্তা কর। আর আমারো অনেক ক্ষুধা লেগেছে। কিছু না খেয়ে ড্রাইভ করতে পারবো না।
মাসুদের কথায় সোহাগ হাসতে হাসতে বলল, কেন? অইযে গাছে ফল দেখতে পাচ্ছিস না?

গাছে উঠে সেগুলা পেরে নিয়ায়। সোহাগের কথা শুনে মাসুদ ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে বলল, মজা করছিস আমার সাথে?
- আরে আমি কই মজা করলাম। মজা তো তুই আমার সাথে করছিস। শর্টকাটের কথা বলে আমাদেরকে এই বাঘ ভাল্লুকের দুনিয়ায় ফাঁসিয়ে দিলি। আমি আগেই বলেছিলাম, শর্টকাট রাস্তাগুলো ভয়ঙ্কর হয়। তখন তো আমাকেই উলটা জ্ঞ্যান দিলি। এখন শিক্ষা হয়েছে? এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় মনে হচ্ছে তোর গাড়িটাই চিবিয়ে খেয়ে ফেলি।
- গাড়ি খাবি কেন? আমাকেই খা। আমাকেই চিবিয়ে খা। যদি শান্তি পাস। বিপদে পরেছি। কোথায় বন্ধুরা একটু সাহাজ্য করবে। কোথায় একটু সাজেশন দিবে। তা না করে ঝগড়া করছিস। মাথা গরম করছিস কেন?
- Sorry. ভুল হয়ে গেছে। এখন ভাব কী করা যেতে পারে। অন্তত একটা খাবারের ব্যাবস্থা করতে হবে। তার পর যা হবার হবে।

এতো বিশাল এলাকায় কোন মানুষ আমরা দেখতে পেলাম না। আর কেই বা আসবে এখানে? চারদিকে পাখির ডাক আর কিছু শেয়াল কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এদিকে ক্রমাগত শীতের তিব্রতা বেড়েই যাচ্ছে। ব্যাগে থেকে সোয়েটার বের করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। শহড়ের চাইতে জঙ্গলে অনেক বেশি ঠান্ডা। মাঝে মাঝে গায়ে কাপুনি দিয়ে উঠছে।
হঠাৎ আমার একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা হলুদ আলোর আভা। অনেক দূরে মনে হয়। মাসুদকে ডেকে জিনিসটা দেখালাম। মাসুদ দেখে বলল, কী ওখানে? আমি বললাম, অখানে মানুষ পাওয়া যেতে পারে। আর চল গিয়ে দেখি। যদি মানুষ পাই, তবে কিছু খেতে দিয়ে সাহাজ্যও করতে পারে।
সোহাগ আগ্রহের সাথে বলল, চল চল যাওয়া যাক। আর কিছুক্ষন না খেয়ে থাকলে নির্ঘাত মারা যাবো।

আল্লাহর নাম নিয়ে সেদিকে এগোনো শুরু করলাম। খুব সাবধানেই এগোচ্ছি। জঙ্গলে প্রচুর শুকনো পাতা পরে থাকে। পাতার খচ খচ শব্দ করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। খুব সাবধানে। জঙ্গলে পাতার নিচে নাকি সাপেদের আড্ডা। কামড় দিলে রক্ষা নেই। শহর এখান থেকে অনেক দূরে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে হুস হুস শব্দ করছি। সাপ থাকলে ভয়ে পালাবে।
অনেক্ষন হাঁটার পর খেয়াল করলাম আলোর তিব্রতা অনেকটা বেড়েছে। হ্যা। ওখানে নিশ্চই কোন মানুষ আছে। পায়ের গতি আরো বাড়ালাম। পাঁচ মিনিট হাঁটার পর সত্যিই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চারদিকে অনেক মশাল জ্বলছে।
আমরা আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। সেখানে কিছু অদ্ভুত ধরনের লোক দেখতে পারলাম। যেমন, আমাদের সামনে একটা বৃদ্ধ লোক বসে ধ্যান করছে। এমনকি লোকটার গায়ে কালো রঙের একটা কাপড় জরানো। আর কয়েকটা জুয়ান জুয়ান লোক সেই বৃদ্ধ লোকটার আশেপাশ দিয়ে ঘুড়ছে আর এক অদ্ভুত ধরনের গান গাইছে। আশেপাশটা অন্যরকম একটা

গন্ধ। আমরা কেবল সেদিকটায় তাকিয়ে ছিলাম। কতক্ষন তাকিয়ে ছিলাম জানিনা, তবে আর কিছুক্ষন পরে খেয়াল করলাম, সব লোকগুলো একসাথে একত্রিত হয়ে সেখানে বসে পরল।
এখানে কী হতে যাচ্ছে তার কিচ্ছুই আমাদের মাথায় ঢুকছে না। আর লোকগুলোর ব্যাবহারও আমাদের কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না। একবার ইচ্ছা হলো, এখানে থেকে লাভ নেই। বরং চলে যাওয়া ভালো। কিন্তু গিয়ে লাভ কী? যদি এখান থেকে কিছু হেল্প পাওয়া যায়, তবুও খারাপ কীসের?
আরো কিছুক্ষন বসে থাকার পর যখন লোকগুলো নিজেদের তাবুর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল তখন কিছু লোক আমাদের দেখে ফেলল। লোকগুলোকে দেখে একটু যেন ভয় ভয়ই করতে লাগল। কারণ আগে থেকেই শুনে আসছি, জঙ্গলের মধ্যে অন্য জাতির মানুষ থাকার কথা। অনেক উপজাতি আছে যারা অনেকটা হিংস্র। কোনভাবে যদি আক্রমন করে বসে তবে ঝামেলা হয়ে যাবে।

কিন্তু তেমনটা হল না। সেই দলের কিছু লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসল। আমাদের শরিরটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করল। তারপর আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয় বুঝতে পারল, যে আমরা খুদার্থ। বিশেষ করে সোহাগ, গাছে হেলান দিয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলো যে, মনে হচ্ছে এখনি মাথা ঘুড়ে পড়ে যাবে।
লোকটা আমাদের হাতের ইশারায় আসতে বলল। বাধ্য হয়ে আমরা লোকটার পেছনে পেছনে রওনা দিলাম। আমরা খেয়াল করলাম, লোকটা এখনো আমাদের সাথে একটা কথা বলে নি। লোকটা কি তাহলে বোবা? হতেই পারে। কিন্তু লোকটার চোখে সরলতার ছাপ। ভালো মানুষের মতোই মনে হচ্ছে।

আমাদের একটা তাবুর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রায় ১০-১২ জনের মতো লোক। সবার গায়ে অদ্ভুত ধরনের পোষাক। আমার মাথায় শুধু এই চিন্তাটাই ঘুড়পাক খাচ্ছে যে, এই লোকগুলো কারা? আসলো কোথা থেকে?
মাসুদ একটা লোকের কাছে গিয়ে বলল, আপনারা কারা? এই ঘণ জঙ্গলে আপনারা কী করছেন? মাসুদের কথা শুনে লোকগুলো একে অপরের দিকে কিছুক্ষন চাওয়াচাওয়ি করল। সোহাগ বলল, দয়া করে আমাদের কিছু খেতে দিন প্লিজ। সকাল থেকে আমরা কিছু খাই নি। কিন্তু আসল কথা হল, লোকগুলো আমাদের কারো কথাই বুঝতে পারে নি। উনাদের সাথে ইশারায় কথা বলা ছাড়া আর কোন নাই। তাই আমি হাত দিয়ে খাওয়ার মত ভঙ্গি করলাম। আমার ইশারা লোকগুলা হয়তো বুঝতে পারল।

মোবাইলের ঘড়িতে দেখলাম এখন প্রায় ৭টা বাঁজে। শীত পরেছে প্রচন্ডরকম। চারদিকে ঘণ কুয়াশা। যদিও এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তাই শীতটা একটু উপশম হচ্ছে।
কিছুক্ষন পর আমাদের তিনজনকে অবাক করে দিয়ে আমাদের জন্য একটা লোক কিছু খাবার আনল। কিছু রুটি আর কিছু মাংস। সাথে একটা পাত্রের মধ্যে পানি। পাত্রটা মাটি দিয়ে বানানো। কয়েকটা রুটি আর মাংস খেয়ে দেহে যেন প্রাণ ফিরে এল।

হঠাৎ কেন যানি একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে খাওয়াটা নষ্ট করে দিল। আমরা যেই মাংসটা খাচ্ছি, এমন মাংস জীবনে কখনো খাইনি। নরম মাংস। স্বাদটাও কেমন যেন। ব্যাপারটা সুবিধার লাগল না।
আসার সময় সেই বৃদ্ধ লোকটার কথা মনে হল, “অনেক বছর ধরে শোনা যাচ্ছে এই জঙ্গলটাতে মানুষ খেকোর আগমন হয়েছে। জবাই করে নাকি মানুষের মাংস খায়।” তাহলে বৃদ্ধ লোকটার কথাই কি সত্যি? আসলেই কি তারা নরমাংস  গ্রহণ করে? আমি তাদের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলাম। লোকগুলোর আচরণ আমার কাছে স্বাভাবিক লাগল না।

মাসুদ আর সোহাগকে বললাম, হয়েছে, খাওয়া বাদ দে। আর এখানে থাকা যাবে না। যত দ্রত পারি এখান থেকে চলে যাবো।
সোহাগ প্রথমে বলল, এখানে থেকে গেলে কী সমস্যা? আজকে রাতটা এখানে থেকে যাই।
আমি বললাম, জায়গাটা আমার কাছে সুবিধার লাগছে না। গাড়িতে ঘুমাবি চল। সকালে ভেবে দেখা যাবে কী করা যায়।

তিনজন উঠে পরলাম। তারপর তাবুর বাইরে গিয়ে সবাইকে বললাম, আমার মনে হচ্ছে সেই পাগল লোকটার কথাগুলো সত্যি। এখানে আসলেই কোন বিপদ আছে। রুটির সাথে দেওয়া মাংসটা আমার কাছে মোটেও সুবিধার মনে হয় নি।
মাসুদ বলল, তারমানে তুই বলতে চাচ্ছিস, লোকগুলো আমাদের মানুষের মাংস রান্না করে খিলিয়েছে?
আমি মাথা নিচু করে বললাম, সেটা জানি না। তবে আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে। মাংসের স্বাদটা অন্যরকম। আর তাছাড়া জায়গাটাও আমার কাছে ভালো ঠেকছে না। সুযোগ পেলে আমাদের উপরেও হামলা করতে পারে।

তিনজন সেখান থেকে বের হয়ে এলাম। শীতের তিব্রতা অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে। গাছের পাতা থেকে টপ টপ করে গায়ে পানি এসে পরছে। সেই তাবুটার থেকে অনেক দুড়ে চলে এলাম। তখন মাসুদ বলল, এই দাড়া। বড্ড ইয়ে পেয়েছে। তোরা দাঁড়া আমি আসছি।
মাসুদ আমাদের থেকে একটু দূরে গেল। আর এদিকে আমি আর সোহাগ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।
অনেক্ষন ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু মাসুদ আসছে না কেন? আবার কোথাও হাড়িয়ে গেল নাকি? জোরে জোরে কয়েকটা ডাক দিলাম। কিন্তু মাসুদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।
বিরক্ত হয়ে বললাম, পেশাব করতে কখনো এত্তো সময় লাগে?
কিছুক্ষন পর মাসুদের দেখা পেলাম। কিন্তু মাসুদের  মুখটা স্বাভাবিক না। মুখে যেন আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। মাসুদ হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে এসে বলল, একটা ভয়ানক জিনিস দেখে আসলাম ভাই।
মাসুদের কথায় চিন্তায় পরে গেলাম। কী এমন ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছে ও। জিজ্ঞাস করলাম,

কী দেখেছিস রে?
- চল আমার সাথে।
অগত্যা আমি আর সোহাগ মাসুদের পেছনে পেছনে যেতে আরাম্ব করলাম। খুব সাবধানে এগুচ্ছি আমরা। আশেপাশের পরিবেশটাও কেমন জানি থমথমে। কোন সারাশব্দ সেই। এখানটাতে যেন কোন ঝি ঝি পোকার ডাকটাও শোনা যাচ্ছে না। আশেপাশের গাছগুলোকে দেখেও কেমন জানি ভয়ানক লাগছে। আর মাসুদ কোন একটা ভয়ানক কিছু দেখাবে, সেই চিন্তায় আমার বুকটা কেমন ধপ ধপ করছে। একবার বলতে ইচ্ছা হলো, মাসুদ! দেখতে হবে না তোর সেই ভয়ানক জিনিস। আয় চলে যাই এখান থেকে। কিন্তু পারলাম না। এগিয়ে চললাম মাসুদের পেছন পেছন।

কিছুক্ষন পরে মাসুদ আমাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে আসল। একটা বাড়ির সামনে। পাকা বাড়ি। সিমেন্টের আবরণ খসে গেছে প্রায়। কিন্তু দরজাটা আটকানো। মাসুদ বলল, জানালার কাছে চল।
- কী আছে জানালার কাছে?
- গেলেই দেখতে পারবি।

মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করলাম। একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম সেখানে। জানালার কাছে যেতেই একটা গোংরানির আওয়াজ পেলাম। ফ্লাশলাইটটা জানালার কাছে ধরতেই যেটা দেখলাম, সেটা দেখার আশা আমি কল্পনাতেও করি নি। একটা লোক। গায়ে শার্ট। ভদ্র লোকের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকটার হাত পা শক্ত কোন দড়ি দিয়ে বাঁধা। লোকটাই কিছুক্ষন পর পর গোংরাচ্ছে।
মাসুদকে বললাম, দ্রুত এই লোককে এখান থেকে উদ্বার করতে হবে। বেশিক্ষন থাকলে মারাও যেতে পারে।

দরজাটা খুলে সেই ঘড়ের ভেতরে ঢুকলাম তিনজনে। লোকটার হাতের ও পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম। লোকটা একটু পানি খেতে চাইল। কিন্তু এখানে পানি পাবো কোথায়।
সোহাগ ব্যাগ থেকে একটা বোতল বের করে বলল, বোতলে কিছু পানি রেখে দিয়েছি। এটা খেতে দে।
লোকটা পানি খাওয়ার পর যেন একটু সুস্থ হল। তারপর কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হয়ে বলল, কে তোমরা? এখানে কী করছো?
- আমরা জঙ্গলে এসে খুব বাঁজে ভাবে ফেঁসে গেছি। সকাল না হলে বের হওয়া কঠিন হবে। কিন্তু আপনার এই অবস্থা কে করেছে?
- অইযে অই লোকগুলাকে দেখেছো না? অরা বন্দি করেছিলো আমাকে। মানুষ খেকো ওরা। আশেপাশে কোন মানুষ দেখলেই বন্দি করে ফেলে।
সোহাগ বলল, কিন্তু আমরা তো সেখানে গিয়েছিলাম। কই, আমাদের তো কিছু করলো না। আরো উলটা আমাদের আপ্যায়ন করলো।

- বলো কী? ভাগ্য ভালো যে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে এসেছ। নইলে আমারই মতো বন্দি হতে। আর তারপর জবাই করতো আমাদের। তোমাদের ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারবো না। তোমাদেরকে যে কী বলে ধন্যবাদ দিবো, সেটার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না।
আমি বললাম, থাক। ধন্যবাদ দিতে হবে না। একজনকে বিপদ থেকে বাঁচানো আরেকজনের কর্তব্য। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। কিন্তু এই ঘণ জঙ্গলে আপনি কী করছিলেন?
- এখানে আমি একটা গবেষণা করতে এসেছি। জঙ্গলের প্রানীদের নিয়ে। কিন্তু এখানে আসার পরেই ওই ভয়ংকর লোকগুলো আমাকে সুযোগ পেয়ে বন্দি করে ফেলে। তারপর এই ঘড়টাতে আঁটকে রাখে। আর তোমাদেরও এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ না। যে কোন সময় আবার আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। ওরা কিন্তু সংখ্যার অনেকগুলো। তারচেয়ে আজকে রাতটা তোমারা আমার ঘড়ে থাকতে পারো।
অবাক হয়ে বললাম, আপনার ঘড় মানে?
- মানে আমার ল্যাব। অস্থায়ী ল্যাব আরকি। কোনরকম থাকি, আর গবেষণার কাজ করি।

আমাদের কাছে সেটাই নিরাপদ মনে হল। এই জায়গাটা মোটেও সুবিধার না। কোন হিংস্র প্রাণীও যেকোন সময় আক্রমণ করতে পারে। তার চেয়ে লোকটার ঘড়েই আজকে রাতটা কাঁটিয়ে সকালে এখান থেকে বের হওয়ার চিন্তা করতে হবে।
এতোক্ষনে বেচারা রাজিব হয়তো হাজার বার ফোন করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ছেলেটার জন্য আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। বেচাড়া কতো আশা করেছিলো যে, আমরা ওর বোনের বিয়েতে গিয়ে সারাদিন একটু মজা করবো। কিন্তু ভাগ্য যে এতোটা খারাপ হবে সেটা তো আমরা জানতাম না। সকল সমস্যার মূল হচ্ছে মাসুদ। না জেনে না শুনে গাড়ি একটা অচেনা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিল। তাছারা আমরা যেই লোকটাকে পাগল বলে উপহাস করে এসেছি, তার সাথে এমন ব্যাবহার করাটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে। পুনারায় তার সাথে দেখা হলে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। যদি সেই লোকটার কথা শুনে এখানে না আসতাম, তবেই ভালো ছিলো।

জঙ্গলের ভিতরে সেই লোকটার দারুন একটা ঘড়। কে বা কারা এই ঘড়গুলা তৈরি করেছিলো তার কোন হদিস পাওয়া যাবে না। তেমনই একটা পুরোনো ঘড়ে আসলাম আমরা। তবে ঘড়টাকে লোকটা দারুনভাবে সাজিয়েছে। একটা শেল্ফের মধ্যে কিছু প্রাণীদের অর্গান। দেখতে একটু বিদঘুটে দেখা গেলেও সেটা ভালো লাগছে। পাশের একটা টেবিলে কিছু বইপত্র আর কিছু ফাইল সাজানো। মাথার উপরে যে বাল্বটা জ্বলছে সেটা সোলার চালিত।

লোকটার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম। তার নাম ড. ইসতিয়াক হোসেন। তবে তার ঠিকানা জানতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক নিজের ঠিকানাটা গোপন করতে চাইছেন।
লোকটা আমাদের শোয়ার জন্য বিছানা তৈরি করে দিলো। আমি বললাম, আপনিও তো অনেক ক্লান্ত। ঘুমাবেন না?
লোকটা জবাব দিল, আজকে অনেক ভয় পেয়েছিলাম, জানো। আজকে রাতে হয়তো আমার

ঘুমই আসবে না। তোমরা বরং ঘুমিয়ে পরো।
এই কথা বলে লোকটা ওপাশের ল্যাবরেটরি রুমে চলে গেল। যাওয়ার আগে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলল, গুড নাইট সবাইকে।

ঘুমিয়ে গেছিলাম। কিন্তু কেন জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। কারণটা বুঝতে পারলাম না। কী হতে পারে? আচ্ছা। পাশের রুম থেকে কিসের যেন একটা শব্দ আসছে। ঘুম ঘুম ভাব থাকায় আমার মাথায় কোন কিছুই ঢুকছে না। কেমন জানি সব আবলতাবল লাগছে। শব্দটা আমার কানে আসছে ঠিকই। কিন্তু সেটা কিসের শব্দ, সেটা আমি আন্দাজ করতে পারছি না। অন্ধকার ঘড়। পাশের ল্যাবের রুম থেকে হালকা আলো চোখে আসে বলেই একটু একটু দেখা যায়। এখন রাত কয়টা বাঁজে সেটাও জানি না, জানার প্রয়োজনবোধও করছি না।
হঠাৎ করে খেয়াল করলাম, একটা ছায়ামুর্তি। হ্যা। ঠিক আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই হালকা আলোটার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকার কারণে, তাই অবয়বটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। কে ইনি? ড. ইশতিয়াক হোসেন? এখানে কী করছেন? আমাদের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ কী? তার তাছাড়া তার হাতে অইটা কী? কী হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন?
লোকটাকে দেখে আমার ঘুমের ভাবটা আস্তে আস্তে কাঁটতে লাগল। আমি খেয়াল করলাম, হ্যা। এটা ড. ইসতিয়াক হোসেনই। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা বিশাল বড় দা। সেটা দেখে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। লোকটা আমাদের দিকে গুটি গুটি পায়েএগিয়ে আসছে। আমি ঘুমিয়েছি সবার বাম পাশে। আর সবার ডানপাশে সুমন।
ড. ইশতিয়াক সুমনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রচন্ড ভয় করছে। হাত পা নাড়াতে গিয়েও খেয়াল করলাম হাত পা নাড়াতে পারছি না। আর ওদিকে লোকটা সুমনের বুকের উপরে উঠে আসল। এর পরের ঘটনাটা কী হতে যাচ্ছে সেটা আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু আমার চিৎকার করার শক্তিটাও আমি পাচ্ছি না।

লোকটা তার হাতের ধাড়ালো দা টা আস্তে আস্তে উচু করছে। সামান্য আলোয় দা টা চক চক করছে। আমি ভাবলাম, যেভাবেই হোক আমাকে শরীরে শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, তা না হলে আজকের রাতটাই হবে আমাদের জীবনের শেষ রাত। যখনি ড. ইসতিয়াক দা টা সম্পুর্ণ উচু করল তখন আমার শরিরে ভয়ানক একটা ঝাঁকি অনুভব করলাম।
লোকটা ভয়ানক একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে সুমনকে যেই সুমনের বুকে কোপ দিয়ে গেল, তখনি ভাবলাম এখন আর হাতে সময় নেই। সাথে সাথে নিজের পা দিয়ে শরীরের সম্পুর্ণ শক্তি দিয়ে লোকটার ডান কাঁধে দিলাম একটা লাথি। লোকটা দুড়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল।

সাথে সাথে উঠে পড়লাম। মাসুদকে ধাক্কা দিলাম। মাসুদও উঠে পরল। এদিকে লোকটা দা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটার ব্যাবহার এখন হিংস্র। মাসুদ উঠে পরিস্থিতি কিছুটা পর্যবেক্ষন করল। তারপর, লোকটাকে পেছন দিক থেকে চেঁপে ধরল। কিন্তু লোকটা তবুও ক্ষান্ত হল না। হাতের দা টা আমার দিকে ছুড়ে দিল। অন্ধকারে সবকিছুই আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। দা টা এসে আমার কাঁধের একপাশে লাগল। প্রায় এক ইঞ্চির মতো ঢুকে

গেল। ব্যাথায় একটা চিৎকার দিলাম। চিৎকারের শব্দ শুনে সোহাগ উঠে পড়ল।
মাসুদ লোকটাকে এখনো ধরে আছে। সামন থেকে সে বলছে, ছেরে দে বলছি। ওর রক্ত খাবো আমি। ছেরে দে শুয়রের বাচ্চা।
আমি আর নিজের রাগকে কন্টোলে রাখতে পারলাম না। সোজা গিয়ে নাকের মধ্যে কয়েকটা ঘুষি লাগিয়ে দিলাম। লোকটার নাক ফেঁটে রক্ত বের হতে লাগল। মাসুদ বলল, "তোকে ভালো মনে করেছিলাম, অথচ এই ছিলো তোর মনে? এখন বুঝতে পারলাম, অই লোকগুলো তোকে কেন আঁটকে রেখেছিল। আসলে সকল সমস্যার মূল হচ্ছিস তুই। আমরা তোকে ছেরে দিয়ে বড্ড ভুল করে ফেলেছি।

আমি রুমের লাইকটা অন করলাম। ড. ইশতিয়াকের চেহারা এখন আর আগের মতো নেই। হিংস্র হয়ে গেছে সেই চেহারা। আমার কাঁধ থেকেও ঝরঝড়িয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কিন্তু এখন যেভাবেই হোক, এই লোককে বেঁধে ফেলতে হবে। পুলিশের কাছে দিতে হবে একে।
ড. ইশতিয়াক হাঁসি মুখে বলল, কোন প্রমাণ আছে তোর কাছে?

আমি আর নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে আমার। যে লোকটা আমাকে ও আমার বন্ধুকে আক্রমণ করতে চেয়েছে। এমনকি আরো কত মানুষকে হত্যা করেছে।

আমার পাশে পরে থাকা দা টা হাতে নিলাম। আর বললাম, তোর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। এই বলে লোকটার ঘাড়ে দা দিয়ে শরিরের সম্পুর্ণ শক্তি দিয়ে একটা কোপ মারলাম।
মাসুদ ভয়ে লোকটাকে ছেড়ে দিল। আর বলল, এটা কী করলি? লোকটাকে খুন করে ফেললি?
আমি বললাম, এটাই ওর প্রাপ্য ছিল।
- পুলিশ কেস হয় যদি?
কিছুক্ষনে ভেবে বললাম, দা টাকে দূরে কোন জায়গায় ফেলে দিতে হবে। আর লাশটাকে পুতে ফেলতে হবে।

সেদিন রাতে আর ঘুম হল না। এই ঘণ জঙ্গলে এমনিতেও কেউ আসবে না। লাসটাকে একটা বস্তায় তুলে সেই বাড়িটার পেছনে গর্ত করে পুতে রেখে দিলাম।

সকাল হয়ে আসছে। এখন চলে যেতে হবে। আবার ক্ষুধা লাগছে। রাতেও সবার অনেক খাটুনি হয়েছে। গাড়িটার কাছে যেতেও অনেকটা সময় লাগল। সবাই গাড়িতে চড়ে বসলাম। মাসুদ খুব সাবধানে গাড়িটা পিছিয়ে নিচ্ছে।

আরো তিন ঘন্টা গাড়ি চালানোর পর আমাদের সেই পাগল লোকটাকে দেখার সৌভাগ্য হল। আমরা লোকটাকে পাগল মনে করেছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমরা কিছু বুঝতে পারি নি। লোকটার কাছে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, আপনাকে গতকাল অনেক খারাপ ভাষায় গালি দিয়েছি। দয়া

করে আমাদের কথায় কোন কিছু মনে করবেন না। আমরা ভুল বুঝতে পারছি।

লোকটা নরম গলায় বলল, হয়েছে বাবা। ভুল হতেই পারে। ভুলটা বুঝতে পেরেছো এটাই অনেক। কিন্তু তোমাদের কোন ক্ষতি হয় নি তো?
- না। আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি।
- কে বলেছে ক্ষতি হয় নি? তোমার কাঁধে এখনো আঘাতের দাগ। তারাতারি দাক্তার কাছে যাও। অনেকখানি কেঁটে গেছে।
লোকটা ঠিকই বলেছে, হাসপাতালে যেতে হবে। ক্ষতস্থানে সেলাই করতে হবে।

ফোনটা একটু নেটওয়ার্ক পেতেই মেসেজের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ৭২ টা sms. ২৫৩ টা মিসড কল। আজকে আমাদের খবর আছে।

# দিবা

ছেলেটার নাম করিম। বয়সটা তার বেশি না। তবে এই অল্প বয়সটাতেই সে যেন মনে হয় অনেক বেড়ে উঠেছে। মা-বাবা মারা গেছে অনেক দিন হল। এই শোকটা করিম ভালোভাবে নিতে পারে নি। দুজনের অল্প বয়সেই চলে যাওয়াতে তার জীবনে সে ভয়াবহ একটা ধাক্কা খায়। সেটা সেরে উঠবে কবে নাগাদ, তার ঠিক ঠিকানা নাই।

মা-বাবা মারা যাওয়াতে যে কেবল কষ্টই পেয়েছে তা মোটেও নয়। আগের সেই চুপচাপ ছেলেটি এখন রাস্তার ভবগুরে ছেলে হয়ে গেছে। জীবনটা তার যেন কেমন হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধব খুব একটা নেই। প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেই। যেন এই সংসার জগতে কিছুই নেই তার।

আছে। তার আপন বলতে কেবল একটা জিনিসই আছে। যার সাথে সে গল্প করতে পারে, ঠাট্টা করতে পারে, কষ্টের কথাগুলো ভাগ করতে পারে। বাবা যেদিন মারা গেল, সেদিনই তাদের গোয়াল ঘড় আলোকিত করে জন্ম নিল একটা গাই বাছুর। করিম বাছুরটার নাম রেখেছিল দিবা। দিবা মানে দিন। ঠিক কিসের কারণে করিমের এই নামটা মাথায় এসেছিলো, তার কোন ধারণা নেই। তবে নামটা তার অনেক ভালো লাগে।

করিম দিবাকে যথেষ্ঠ আদর যত্ন করে। দিবা অনেকটাই বড় হয়ে উঠল। কিন্তু একদিন করিমের মায়ের হল ভয়াবহ একটা অসুখ। দিবার মাকে তখন বিক্রি করে দিতে হল হাটে। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। অনেক চেষ্টা করেও করিমের মাকে বাঁচানো গেল না। করিম এবং দিবা, দুজনেই মায়ের অভাবে এতিম হয়ে গেল।

সেই থেকে দিবাই করিমের সব। তার সাথেই গল্প করে। নিয়মিত মাঠে যায় তাকে নিয়ে। দিবা ঘাস খায়। আর করিম অপলকভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন মনে হয়, এই গরুটাই তার জীবনের সব। সকল ভালোবাসা কেবল এই গরুটার জন্য। কী আজব ব্যাপার। মায়া জীনিসটা আসলেই অনেক ভয়ানক। কোন কিছুর প্রতি একবার মায়া হয়ে গেলে সেটাকে ছেরে যাওয়া অনেকটাই কষ্টকর। করিমও গরুটার মায়ায় পরে গেছে। সেই মায়াও ভয়ানক। এখন মনে হয় দুনিয়াটা কেবল করিম এবং সেই গরুটার জন্য, সেই দুনিয়ায় আর কারো আসার অধিকার নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় তার এক পুরোনো বন্ধু তাকে ডেকে নিয়ে গেল। কারণটা করিম জানে। বন্ধুটা তাকে কিছু খাওয়াবে। ইদানিং করিমের মদের নেশাটা বেড়ে গেছে। মদ খেলে কিছুক্ষনের জন্য তার জমানো ব্যাথাটা ভুলে থাকতে পারে সে। প্রথম যখন করিম মদ হাতে নিল তখন খুব সাবধানে খেত। অল্পতেই নেশা ধরে যেত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখন অনেকটুকু খেলেও ঠিকমত নেশা হয় না। কিন্তু ভালো লাগে। দুনিয়াদারির কিছু খেয়াল থাকে না। মাথাটা হালকা হালকা লাগে।

গতবারের চেয়ে আজকে রাতে নেশাটা যেন একটু বেশিই হয়ে গেল। মাথা ঘুড়াচ্ছে প্রচন্ড। সেদিন রাতে সে আর তার বাড়িতে যেতে পারল না। হাঁটার শক্তি সে পাচ্ছে না। তাই আজকে রাতে সে সেই জায়গাটাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে তার ঘুম ভাংল। যাক। এখন একটু ভালো লাগছে। যদিও মাথা ব্যাথাটা একটু একটু আছে, সেটা স্বাভাবিক। করিম মনে মনে ভাবল, আজকের দিনটা ভালো যেতে পারে। এমনকি ভালোই যেতে পারত। কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ায় তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এক ঝাকি দিয়ে উঠে পড়ল সেখান থেকে। আর এক মুহুর্তের জন্যও দাড়াল না। প্রাণপনে দৌড়ে গেল মাঠের দিকে।

গতকাল দুপুরে গরুটাকে মাঠে দিয়েছিল করিম। ভেবেছিল সন্ধ্যায় গরুটাকে মাঠ থেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে সেটা এক্কেবারেই ভুলে গেছে। গরুটার কথা ভুলে গিয়ে সে চলে এসেছে বন্ধুর বাড়ি মদ খেতে। ছি ছি। এমনটা সে করতে পারল? তার প্রিয় জিনিসটাকে সে কীভাবে ভুলে যেতে পারল? করিম নিজেই নিজের মাথাতে কয়েকটা থাপ্পড় দিল।
করিম মাঠে গেল। বেলা অনেক হয়ে এসেছে। গেরস্তরা তাদের গরুগুলিকেও মাঠে নিয়ে এসেছে। সেগুলি মাথা নিচু করে ঘাস খাচ্ছে। কিন্তু করিম কোনভাবেই তার দিবাকে মাঠে দেখতে পেল না। আশেপাশে অনেক্ষন খোঁজাখুজি করল। যেখানে বেঁধেছিল, সেখানে খুঁজল। কিন্তু কোথাও নেই গরুটা। গেল কোথায়?
এদিকে করিমের অবস্থা তো পাগলপ্রায়। চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে বেচারা। কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করায় তারা বলল, সকালেও নাকি তারা এখানে কোন গরু দেখে নি। করিম সেখানেই বসে কান্না করে দিল। মাথা চাপড়াল অনেকবার। কেন সে দিবার কথা ভুলে গেল। এইবার থেকে সে প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনো সে ওসব খাবে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল। এলাকার কেউ গরুটার খোঁজখবর দিতে পারছে না। এদিকে করিমের খাওয়া নেই দাওয়া নেই। এসবের কথা যেন সে ভুলেই গেছে। তার মনে এখন শুধু দিবা আর দিবা।
সন্ধ্যার দিকে একটা খবর আসে তার কানে। পাশের গ্রামের ইকবাল মুন্সির পুকুরে নাকি একটা মরা গরু পরে আছে। কথাটা শুনে করিমের পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যায়। সে প্রাণপনে দৌড়ে ইকবাল মুন্সির পুকুরের দিকে রওনা হয়। অনেকেই জিনিসটা দেখতে যাচ্ছে। করিম হাপিয়ে হাপিয়ে সেই পুকুরের কাছে এসেই মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। হ্যাঁ। এটাই তার দিবা। তার একমাত্র সম্বল।
মরা গরুটার উপর দিয়ে মাছি উরছে অনবরত। গতরাতেই হয়তো মরেছে। কিন্তু কিসে মেরেছে সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে মেরেছে, সে অতি হিংস্র। গরুটার মাথা অনেক দূরে ছিটকে পড়ে আছে। দুটা পা মটকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গলার কাছ থেকে খুবলে মাংস খেয়েছে। যদিও এটা কোন মানুষের মৃতদেহ না। তবুও জিনিসটা দেখে সবারই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এর কারণ, কে এভাবে গরুটাকে হত্যা করল?
গ্রামের কয়েকটা মহিলা বলাবলি করছে, গেরামে রাক্ষসের আগমন হইছে। অই রাক্ষসই এই গরুডারে মারছে। শিয়াল কুত্তায় তো আর এইভাবে কামড়াইতে পারবো না।

করিমের মাথায় পানি দিয়ে করিমকে উঠানো হল। করিমের মাথায় কোন কাজ করছে না। কেমনে কী হয়ে গেল। দিবাকে ছাড়া সে বাঁচবে কীভাবে? করিম আস্তে আস্তে গরুটার কাছে এগিয়ে গেল। যাওয়ার পরে চিৎকার করে সবাইকে বলতে লাগল, "না না। এইটা আমার গরু না। এইটা না। আমার গরু মরে নাই। ও বেঁচে আছে। এইটা অন্য কারো গরু।" এই কথা বলে করিম নিজের বাড়িতে চলে আসল।
বাড়িতে এসে অনেক্ষন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান্না করল। আর মনে মনে বলতে লাগল, দিবা! তুই যেখানেই থাকিস আমার কাছে ফিরে আয়। তোকে ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচব?
সেদিন রাতে করিম কান্না করতে করতে সেখানেই ঘুমিয়ে গেল।
করিমের যখন ঘুম ভাংল তখনও অনেক রাত। বাইরে জোৎস্না। জানালাটা খোলা। দরজাটা আটকাতেও ভুলে গেছিলো সে। ঘুম ঘুম ভাবটা একটু কাঁটল। করিম একটা জিনিস দেখে ধরমরিয়ে উঠে পড়ল। ভাঙা টিনের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট একটা ছায়া দেখতে পেল। কার ছায়া হতে পারে ওটা?
করিম বিছানা থেকে নামল। ভয় করছে অনেক। করিম একবার ডাকল, "কে বাইরে?" ছায়াটা একবার নড়ে উঠল। করিম আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা খুলল। করিম যখন বাইরে তাকাল। খুশিতে তার মুখটা চক চক করে উঠল। সে বাইরে দেখল, বাইরে দিবা দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াচ্ছে। আর করিমের দিকে তাকিয়ে আছে। করিম খুশিতে দৌড়ে দিবার কাছে চলে আসল। দিবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কোথায় ছিলি তুই? এদিকে তোকে খুঁজে খুঁজে আমি মরে যাচ্ছি। আমাকে ছেরে কোথায় গেছিলি? জানিস না? তোকে ছাড়া আমার আর কিছু নাই। বজ্জাত কোথাকার। আর যদি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাস। তাহলে এর ফল ভালো হবে বলে দিলাম। করিমের চোখের জলে দিবার গায়ের ফর্সা লোমগুলো ভিজে যাচ্ছে। করিম গলা ছাড়ছে না।

পরদিন করিম দিবার জন্য কাঁচি দিয়ে খর কাঁটে। লবল ভুসি দিয়ে পানি দিয়ে মেখে খেতে দেয়। কিন্তু দিবা খায় না। করিমের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে আছে। করিম হাসি দিয়ে বলে, কিরে খাচ্ছিস না কেন? কিছু বলবি? বল তাহলে। শুনি।
দিবা কিছু বলে না। বলতেও পারে না। কেবল করিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিবা কিছুই খেল না। করিম বলল, ভয় পেয়েছিস সেদিন রাতে? আসলে আমারই দোষটা ছিলো রে। কেন যে তোর কথা সেদিন ভুলে গেলাম। তুই মাঠে সারারাত একা একা ছিলি, তোর অনেক কষ্ট হয়েছে তাই না? করিম আবার দিবার গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, এরকম ভুল আর জীবনে হবে না। এই কান ধরলাম। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এসব নেশা ফেশা আর করব না।

করিম দিবার গলায় দড়ি বেঁধে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেল। করিম আগে যাচ্ছে। দিবা করিমের পেছনে পেছনে আসছে। করিম হাঁটতে হাঁটতে পিছনে তাকিয়ে দিবার সাথে গল্প করে। মাঠের আশেপাশে কিছু গেরস্ত লোক গরু নিয়ে এসেছে। তারা করিমকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। কয়েকটা লোক তো বলেই দিলো, করিম! নেশাটেশা করিস নাকি? দিন দিন তো পাগল হয়ে যাচ্ছিস।

করিম তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না। সে মনে মনে ভাবে, গরুর সাথে কথা বললে কেউ পাগল হয় না। যার আপন কেউ নেই, সে যে কোন কিছুর সাথেই কথা বলতে পারে। যেমন: গাছের সাথে, ঘাসের সাথে, পাখির সাথে।

দিবা দুড়ে বসে ঘাস খাচ্ছে। করিম গাছের নিচে বসে দিবার ঘাস খাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। দিবাও মাঝে মাঝে করিমের দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো তাকিয়ে দেখছে, তার মালিক এখনো আছে নাকি।
বিকাল হলেই করিম দিবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তারপর বাড়িতে গিয়ে গামলার মধ্যে পানি দিয়ে সাথে লবন মিশিয়ে দিবাকে খেতে দেয়। তারপর গোয়াল ঘড়ে বাঁধে দিবাকে। করিম গোয়াল ঘড়ে বসেও দিবার পাশে অনেক্ষন বসে থাকে। দিবার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করে।

এলাকার কিছু ছেলেমেয়ে এসে করিমের কার্যকলাপ দেখে খিলখিলিয়ে হাসে। করিম বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। ইদানিং শুধু বাচ্চা ছেলেমেয়েরাই না। বয়স্ক লোকেরাও করিমের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসে। আর করিমকে বলে, কিরে করিম। দিন দিন তো পাগল হয়ে যাচ্ছিস, বিষয়টা কী খেয়াল করেছিস? করিম থেমে গিয়ে লোকটার কাছে যায়। গিয়ে বলে, আমি পাগল হয়ে গেলে এলাকায় কী কোন সমস্যা হবে? বাবার যখন মারা গেল। বাবার চিকিৎসার জন্য টাকাপয়সা ছিলো না। গ্রামের সবার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কয়জন সাহাজ্য করেছিল? এলাকার মানুষ আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ি। কয়টা টাকা দিয়ে সাহায্য করলে বাবা হয়তো আজ বেঁচে থাকতো। এই এলাকার একটা মানুষকেও আমি ক্ষমা করবো না।
করিম দিবাকে নিয়ে মাঠে চলে যায়। বসে বসে দিবার ঘাস খাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। এলাকার লোকেরা করিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকেরা কী যেন কানাকানি করে। করিম সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার দৃষ্টি কেবল দিবার ঘাস খাওয়ার দিকেই সীমাবদ্ধ।
বিকালে করিম দিবাকে নিয়ে বাড়িতে আসে। দিবার গলার দড়ি টেনে নিয়ে আসে। দিবা পেছনে পেছনে আসে। বাড়িতে এসে দিবাকে খেতে দেয়। পানি দেয়, ভুসি দেয়। দিবা সেগুলো চুক চুক শব্দ করে খায়। করিমের বিষয়টা দারুন লাগে।

এভাবেই চলছে করিমের জীবনটা। সকাল হলে করিম দিবাকে নিয়ে আবার মাঠে যায়। করিম দড়ি টেনে নিয়ে যায়। পেছনে দিবা। এলাকার কয়েকটা মানুষ আফসোস করে বলে, আহারে বেচাড়া করিম। অল্প বয়সেই বাপ মা মরল। আবার কিছুদিন আগে নিজের প্রিয় গরুটাও হাড়াল। ছেলেটা আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছে। সকাল বিকাল গরুর দড়িটা নিয়ে মাঠে যায়। মাঠে গিয়ে দড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকাল হলে অই খালি দড়িটা নিয়েই বাড়ি ফেরে। দড়িটাই কেবল ওর গরুর একমাত্র সৃতি।
বিকালে করিম ভুসি মাখিয়ে পাশে বসে থাকে। সেখানে গরুটাকে কল্পনা করে। সে এখনো দেখতে পায়, দিবা খাচ্ছে। আরাম করে খাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে করিমের দিকে তাকিয়ে

আছে।
গোয়াল ঘড়ে বসে বসে করিম একা একাই সেই দড়িটার সাথে গল্প করে। প্রতিবেশি ছেলেমেয়েরা সেটা দেখে হাসে।

কিন্তু করিম সেগুলোকে ভ্রুক্ষেপ করে না। করিম এখনো দেখে, দিবা ভুসি খাচ্ছে। এবং কিছুক্ষন পর পর অপলকভাবে করিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিবার চোখ হঠাৎ জ্বল জ্বল করে উঠে। করিমকে মুখ ফুঁটে বলতে চায় অনেক কিছু।

২৬ মে ২০২৪, রবিবার।

## এ প্লাস

অন্তর। ছেলেটার খুব শখ ছিলো ক্রিকেটার হওয়ার। বলতে গেলে ক্রিকেট খেলা তার নেশা। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার বড় বাঁধা হচ্ছে, তার ফ্যামেলি। অন্তরের বাবা একজন এমবিবিএস ডাক্তার। একটা মাত্র ছেলে তার। তাই তার ছেলেকে নিয়েই জীবনের সবকিছু। তার বাবা যেমন ডাক্তার, এমনকি তাকেও ডাক্তার হতে হবে। এটা তার বাবার ইচ্ছা।
অন্তরের মা শিক্ষকতা করেন। দিনের বেশিরভাগ সময় তাই অন্তরকে একা কাঁটাতে হয়। তার বাবা মা তাদের নির্দিষ্ট কাজে চলে যায়। আর অন্তর চলে যায় স্কুলে। তার স্কুল ছুটি হয় দুপুর দুইটায়। স্কুল থেকে ফিরেই অন্তর ব্যাটবল নিয়ে বাইরে বের হয়। আর ফেরে সন্ধ্যায়।

অন্তর যে বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলতে বের হয় এটা কেবলমাত্র তার মা জানে। তার বাবা বিষয়টা জানে না। জানলে ঝামেলা হয়ে যাবে। কারণ অন্তরের বাবার আদেশ, স্কুল থেকে এসে খেয়েদেয়ে পড়তে বসতে হবে। কারণ সামনে এসএসসি পরিক্ষা। যেভাবেই হোক, অন্তরকে এ প্লাস পেতেই হবে। তাই বাবার কড়া আদেশ। এ প্লাস না পেলে ভালো ডাক্তার কোনদিনই হওয়া যাবে না।
অন্তর অনেকবার বলেছে যে, সে বড় হয়ে ক্রিকেটার হতে চায়। নিজের দেশের হয়ে খেলতে চায়। কিন্তু তার বাবা তার কথা কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নি। তার কেবল একটাই কথা, আমার ছেলে মাত্র একটাই। এবং তাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে কোনভাবেই সে ঠেলে দিতে পারবে না। তাকে ডাক্তার হতে হবে, তার বাবার চেয়ে ভালো ডাক্তার হতে হবে।

কিন্তু অন্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার লেখাপড়ার অবস্থা খুব একটা ভালো না। কারণ সে মনে করে, তার দ্বারা লেখাপড়া হবে না। কারণ, তাকে ক্রিকেটার হতে হবে।
সবকিছু ভালোই চলছিল। যদিও অন্তরের মা মাঝে মাঝেই ছেলেকে বকাঝকা করে। বিকালবেলা পড়তে বসতে বলে। কিন্তু অন্তর এই কথা মোটেও শুনতে রাজি না। তার মতে সকল ছেলেরই উচিৎ বিকেলবেলা খেলাধুলা করা। তার শিক্ষক একবার বলেছিল, বিকেলে পড়া মুখস্থ হয় কম। কিন্তু সেই কথা অন্তরের বাবা শুনতে রাজি না। তার মতে, সময় মুল্যবান। তাই কোনভাবে সেই সময়টাকে অপচয় করা ঠিক না। কারণ, যেই সময় চলে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না।

কিন্তু কোন একদিন অন্তরের বাবা কেমনে জানি জেনে গেল যে অন্তর বিকেল বেলা বাইরে খেলতে যায়। সেদিন অন্তর আর কিছু বলতে পারলো না। অন্তরের বাবা তার ছেলেকে এবং তার বউকে যাচ্ছেতাই বকুনি। বিশেষ করে অন্তরের মাকে। "সন্ধ্যায় তো বাসাতেই থাকো। তাহলে ছেলেকে কিভাবে খেলতে পাঠাও। ছেলেটার ভবিষ্যতটা এভাবে ভাংতে লজ্জা করছে না? কিছুদিন পরে ওর এসএসসি পরিক্ষা। এখন নাকি আমার ছেলে লেখাপড়া বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলেতে যায়। বলি, মাথার সব জ্ঞান বুদ্বি কি খেয়ে ফেলেছো?"
তার বাবার কথা শুনে দুজনেই চুপ করে থাকে। যদিও তার মা একবার বলেছিল, "আরে। একটু বাইরে গেলে কী এমন ক্ষতি হবে?"

তার স্বামী অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, কী বললে তুমি? বুঝেছি তুমিও চাও আমার ছেলে ডাক্তার না হয়ে ক্রিকেট খেলুক। বাহ্! ছেলেকে সাপোর্ট দিচ্ছো।
সেদিন অন্তরের বাবা বলে দিলেন, কালকে বিকাল থেকে বাসার টিচার আসবে। এখন থেকে অন্তর বিকালবেলা টিচারের কাছে ম্যাথ আর ইংলিশ পড়বে। পরিক্ষার আগ পর্যন্ত নো ক্রিকেট নো প্লে।

তারপর দিন থেকে আর অন্তর বাইরে যেতে পারে না। স্কুল থেকে এসে খাওয়াদাওয়া করে। গোছল করার আগেই টিচার রুমে এসে বসে থাকে। টিচার ম্যাথ পড়ানো আরাম্ব করে। কিন্তু অন্তর ছোটবেলা থেকেই ম্যাথে দুর্বল। ম্যাথের কনসেপ্টগুলো কোনভাবেই তার মাথায় ঢুকে না। ইংলিশে সে আরো দুর্বল। বিশেষ করে মুখস্ত করার ক্ষমতা প্রায় নাই বললেই চলে।
কিন্তু টিচার ছাড় দেয় না। বাবার আদেশ, প্রচুর হোমওয়ার্ক এবং প্রচুর পড়া দিতে হবে। যাতে ক্রিকেটের চিন্তা মাথা থেকে পুরোপুরি চলে যায়।

কিন্তু অন্তর কোনভাবেই সেই চিন্তা মাথা থেকে বের করতে পারে না। পড়া মুখস্থ হয় না। তার বাবা এ নিয়ে খুব চিন্তা করে। কী হবে এই ছেলেকে দিয়ে? সেবার অন্তর টেস্ট পরিক্ষা দিল। ম্যাথে ১০০ তে পেল ৪৫। আর ইংরেজীতে পেল ৩৮। এই রেজাল্ট সে তার বাবাকে কীভাবে জানাবে? এই রেজাল্ট তার বাবা অবশ্যই জানবে। স্কুলের কোন বিষয়ই তার বাবার থেকে লুকানো যায় না।
হলোও তাই। রাতের বেলা বাসায় এসে তার বাবা বলল, অন্তর! তোর না আজকে রেজাল্ট হয়েছে। তা রেজাল্ট শিটটা কোথায়? অন্তর ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে রেজাল্ট শিটটা নিয়ে গেল। অন্তরের বাবা শিটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষন কাগজটার দিকে থ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ লাল করে ছেলের দিকে তাকিয়ে ভাড়ি গলায় বললেন, এই তোর রেজাল্ট? সব সাবজেক্টে টেনেটুনে পাস। এত্তোগুলা স্যারের কাছে পড়তে দিয়েছি। আর তোর রেজাল্ট এমন। ছি ছি। পরিক্ষার আর মাত্র ২ মাস বাকি। আর এখন নাকি ছেলে কোনরকম পাস করে। এসএসসিতে এ প্লাস পাবি কিভাবে?
চড় খেয়ে অন্তরের গাল লাল টকটকে হয়ে গেল। তার বাবা বার বার বলছে, এতো টাকা খরচ করে তোর লেখাপড়া করাচ্ছি। এর তুই এর কী প্রতিদান দিলি? অন্তর আর কোন কথা বলল না। চুপ করে শুধু শুনেই গেল। আজ নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছে।
তার বাবা একসময় বলল, আর না। তোকে অনেক ছাড় দিয়েছি। আর এক বিন্দুও ছাড় দিবো না। যদি শুনি তুই পরিক্ষার আগে বাইরে খেলতে গিয়েছিস। তোর ভাত বন্ধ। এই দুই মাস শুধু পড়া আর পড়া। রাতেও তোর টিউশনির ব্যাবস্থা করছি।

পরিক্ষার আগের দিনগুলোতে অন্তরকে ঘড়বন্ধী করে রাখা হয়েছে। নিজের বিনোদনের জন্য কোন কিছুই সে তখন করতে পারত না। একটা ঘড়। সেই ঘড়েই এটাচ বাথরুম। কাজের বুয়া অন্তরকে তিন বেলা খাবার দিয়ে যেত। টেস্ট পরিক্ষার পরে স্কুল বন্ধ। তাই আর স্কুলের ছুতো দিয়ে বাইরে যাওয়া হয় না। সকাল বেলা, বিকাল বেলা আর রাতের বেলা টিচার এসে অন্তরকে

পড়িয়ে যায়। সেই পড়া আবার অন্তরকে একা একা রেডি় রাখতে হয়। এত্তো পড়া দেখে অন্তর হতাস হয়ে যায়। বইয়ের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখের পানি ফেলে। এসব কষ্ট আর সহ্য হয় না তার। তার এতো পড়তে ইচ্ছে করে না। ম্যাথের বড় বড় সুত্র আর ইংলিসের লম্বা লম্বা কম্পোজিশন তার মুখস্থ হয় না। কিন্তু এই জিনিসটা তার বাবা বোঝে না। তার বাবা শুধু বোঝে তার ছেলেকে এ প্লাস পেতে হবে। বড় ডাক্তার হতে হবে। সেটা যেভাবেই হোক। এটা করতে গিয়ে সে যদি মরেও যায়। এতেও কোন অসুবিধা নেই।

অনেক রাত হয়ে যায়। ঘুমে অন্তরের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে বইয়ের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। কিছুক্ষন পরে তার বাবা এসে দেখবে অন্তর ঘুমিয়ে আছে। অন্তরের বাবা ধমক দিবেন। ঘাড়ে পানি ছিটিয়ে দিবেন। তারপর টানা বিশ মিনিট গালি দিবেন। কিন্তু অন্তরের মাথায় সেগুলার একটাও ঢুকবে না। কারণ, সে ঘুমের ঘোরে আছে। রাতে আর তার পড়াশুনা হয় না। টেবিলের উপরেই ঘুমিয়ে যায়।

আচ্ছা! এই বিপদ থেকে অন্তর কবে মুক্তি পাবে? এ প্লাস পেলেই তো মনে হয় তার মুক্তি এবং এতেই তার বাবা অনেক খুশি হবে। অন্তর আবার পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়। পড়ার চেষ্টা করে। তাকে এ প্লাস পেতে হবে। ডাক্তার হতে হবে। ডাক্তার?
ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তার কখনোই ছিলো না। সারা জীবন যে ভেবেছে সে একজন ভালো ক্রিকেটার হবে। এবং সেটাই সে হবে। সে অনেক ভালো খেলতে পারে। বন্ধুবান্ধব এমনকি স্কুলের স্যাররাও বলেছে, অন্তর অনেক ভালো ক্রিকেট খেলে। সমস্যা কেবল তার বাবা। তার বাবা সেটা কোনদিন চায় না।

আস্তে আস্তে পরিক্ষার দিনগুলো এগিয়ে আসছে। অন্তরের পড়ার চাপ দিন দিন না কমে বরং বাড়তে লাগল। টিচার আগের চাইতে ডাবল পড়া দেয়। এতো পড়া সে পড়তে পারে না। কিছুদিন পর অন্তর খেয়াল করল, তার মাথা ব্যাথা দিন দিন বাড়ছে। দূরের কোন কিছু সে ভালোমতে দেখতে পারে না। চোখে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।
বাবার নির্দেশ, এই সময়টাতে তাকে কোনভাবেই অসুস্থ হওয়া যাবে না। নিজের শরিরের যত্ন নিতে হবে। অসুস্থ হলে পরিক্ষা মোটেও ভালো হবে না। কিন্তু সে তার বাবার কথা রাখতে পারল না। তার শরির ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পড়তে গেলেই ঘুম এসে পড়ে। সাথে হাত পায়ে প্রচুর ব্যাথা করে।

অন্তরের পরিক্ষা শুরু হল। অনেক দিন পর মনে হয় সে ঘড় থেকে বের হয়ে পরিক্ষা দিতে গেল। তিব্র মাথা ব্যাথা নিয়ে সে পরিক্ষা দিতে গেল। কারো শরির দুর্বল হয়ে গেলে সেটার প্রভাব হাতের লেখার উপরেও পড়ে। তার জন্য অন্তরের হাতের লেখা প্রচন্ড রকমের খারাপ হল। তারমধ্যে চারটা পরিক্ষা দেওয়ার পর আসল তীব্র জ্বর। পরিক্ষার আগের সময়টাতে সে কিছুই পড়তে পারল না। অন্তরের পরিক্ষা সেবার অনেক খারাপ হল। তার বাবা এ প্লাস পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়ে দিল।

অন্তরের মনটা অনেক খারাপ। অনেক কষ্ট করে সে পড়ালেখা করেছে এই কতদিন। এক মাসের মধ্যে সে অনেক মেধাবী হয়ে গেছিলো। কিন্তু শুধু মেধাবী হলেই চলবে না। সুস্থতার দিকেও তার খেয়াল রাখতে হবে। অন্তর ভেবেছিল, পরিক্ষার পরের সময়টা সে ক্রিকেট খেলে পার করে দিবে। কিন্তু অন্তরের শরিরে খেলার মতো শক্তি নেই। তাই খেলতেও ইচ্ছা করে না। এই কয়দিনেই ওর স্বভাবের অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এদিকে তার বাবাও অনেক খুশি এই ভেবে যে, তার ছেলেটার খেলার প্রতি আসক্তি অনেকটাই কমে গেছে। ডাক্তার বলেছে, অন্তরের শরিরে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হয়েছে। যার কারণে শরির দুর্বল এবং হাত পায়ে ব্যথা করে। এর জন্য রোদে যেতে হবে। আর নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে।
কিন্তু অন্তরের এখন বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। সেই আগের মতো বিছানায় শুয়ে-বসে থাকে। কারো সাথে কোন কথা বলতে চায় না। ছেলেটা যেন কেমন দিন দিন রোবটের মতো হয়ে যাচ্ছে। তার মা ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করে। এমন ছেলে তো তারা আশা করে নি। তারা চেয়েছিল, তার ছেলেটা হাসিখুশি থাকুক। তার মা ছেলের কাছে গিয়ে বলে, সারাদিন এভাবে মন খারাপ করে বসে থাকিস কেন? তোর বন্ধুরা বাইরে খেলতে যায়। তোকে ডাকতে আসে প্রতিদিন। কিন্তু তুই যাস না।
- যেতে ইচ্ছা করে না।
- আগে তো খুব ইচ্ছা করতো। এখন তো আর কেউ তোকে পড়াশুনা করতে বলে না। সারাদিন অনেক সময়। যা। বাইরে যা। এভাবে ঘড়ে থাকলে তো দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাবি।
- বললাম তো ইচ্ছা নেই।
তার মা আর কথা এগোয় না। চলে আসে ছেলের কাছ থেকে। যাওয়ার আগে বলে যায়, কিছু রান্না করে দিবো? খাবি?
- ক্ষুধা নেই আমার।
তার মা চলে যায়। মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকায়। ভাবে, ছেলেকে অমনভাবে পড়াশুনায় চাপ দেওয়াটা ঠিক হয় নি। একটু বাইরে গিয়ে খেলত। রেজাল্টটা না হয় একটু খারাপই হলো। ডাক্তার নাহয় না-ই হলো। ছেলেকে যে ডাক্তারই হতে হবে এমন কোন কথা তো নেই। কিন্তু ছেলে যদি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে?

আস্তে আস্তে অন্তরের রেজাল্ট দেওয়ার সময় হয়ে আসল। ছেলের রেজাল্ট নিয়ে বাবা মায়ের অনেক উত্তেজনা। তার বাবা ভেবে রেখেছেন ছেলে এইবার ভালো রেজাল্টই করবে। ছেলে তো অনেক পরিশ্রম করেছে। এ প্লাস না পেলেও রেজাল্ট তো ভালো হবারই কথা।
বাবা মায়ে চিন্তা কমলেও দেখা যাচ্ছে অন্তরের চিন্তা মোটেও কমছে না। খাওয়াদাওয়া করছেনা ঠিকমতো ছেলেটা। দিন দিন তার অবস্থার আরো অবনতি হতে লাগল। সারাক্ষন ছেলেটা একটা ভয়ের মধ্যে থাকে।

১৪ তারিখ। আজকে অন্তরের রেজাল্ট। তার বাবা চিন্তা করেছে, ছেলের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে আসবে। ছেলেকে সে আর কষ্ট দিবে না এভাবে। তার মা তার জন্য ভালো ভালো খাবার রান্না করেছে। ছেলের রেজাল্ট যেমনটাই হোক, তারা ছেলেকে সারপ্রাইজ দিবে। ছেলেকে

বুঝিয়ে বলতে হবে, তো যা ইচ্ছা তুই তাই হবি। অনেক বড় একজন খেলোয়ার হবি। তোকে টিভিতে দেখাবে। সবাই বলবে, অমুকের ছেলেকে টিভিতে দেখাচ্ছে। বিদেশ গিয়ে কী সুন্দর করে ইংলিশে কথা বলবে। ভেবেই তার মায়ের চোখে পানি চলে আসে।

অন্তরের বাবা মিষ্টি নিয়ে এসেছে বাসায়। মা অনেক কিছু রান্না করেছে। অন্তর দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে হয়তো। ছেলের তো চিন্তা হবারই কথা।
দুপুর ১২ টার দিকে অন্তরের রেজাল্ট বের হয়। খুব উৎসাহ নিয়ে ছেলের রোল নাম্বার দিয়ে ওয়েবসাইটে লগ-ইন করলো তার বাবা। আর কয়েক সেকেন্ড। কয়েকটা মুহুর্ত। তার পরেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে ছেলের রেজাল্ট। উৎসাহ। প্রবল উৎসাহ। মুখের কিঞ্চিত হাসি ফুটে উঠল তার বাবার। তার স্ত্রীর হাতে মোবাইলটা দিল।
A+... অন্তর A+ পেয়েছে। উল্লাস করে উঠল দুজনে। ছেলের সকল পরিশ্রম সফল। অন্তরের বাবাও আজকে বাইরে গেলে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, আমার ছেলে A+ পেয়েছে। ভেবেই তার মুখটা বার বার উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্তর কোথায়?
তার বাবা মিষ্টির প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে হাতে নিল। অন্তরের বাবার পেছনে পেছনে তার মা-ও গেল। ছেলের  রুমের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলল। দরজাটা খুলতেই তারা দুজন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্তরের বাবার হাত থেকে মিষ্টিটা নিচে পরে গেল। অন্তরের মা ধপাস করে ফ্লোরে বসে পড়ল। এমনটা তো তারা কখনো আশা করে নি।

১৪ তারিখ। আজকের দিনটা তাদের জীবনের সবচেয়ে কালো একটা অধ্যায়। সামনে অন্তরের লা*শ। ফাঁ*সি দিয়েছে অন্তর। তার বাবা ছেলের লাশের এক কোনে বসে আছে। তার চোখে পানি নেই। তার একমাত্র ছেলেটা যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, এই কথা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। এইযে তার ছেলে, তার সামনে সুন্দর করে ঘুমিয়ে আছে। যেন একটু পরেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়বে। উঠেই তার বাবাকে বলবে, বাবা! ব্যাট-টা পুরোনো হয়ে গেছে। কাল আসার সময় একটা নিয়ে এসো প্লিজ।
মিষ্টির প্যাকেটগুলো থেকে সেদিন আর কারো মিষ্টি খাওয়া হবে না। মায়ের বানানো পিঠাও কেউ আর খেতে আসবে না।
তার মা-ও অন্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি অন্তরও তার মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। নাহ। ছেলেটা তো মরে নি। অইজে বেঁচে আছে। অন্তরের মা স্পষ্ট খেয়াল করল, তার ছেলে তাকে মা বলে ডাকল। কাফনের কাপড়ে সাড়া শরির জড়ানো ছেলেটার। শুধু মুখটা খোলা আছে। অন্তর বলল, মা! আমাকে তোমরা মাফ করে দিও। তোমাদের স্বপ্নটা আমি পুরণ করতে পারলাম না। বাবাকেও আমার পক্ষ থেকে সরি বলে দিও। আর যদি আমার আবার কোন ভাইয়ের জন্ম হয়। তবে তার জীবনটা তাকেই গড়তে দিও।
অন্তরের মায়ের চোখ জুরে পানি। ছেলেটা এখনো তাকিয়ে আছে। আর বলছে, আমার খুব খারাপ লাগছে মা। এখানকার দুনিয়াটা কেমন যেন, সম্পুর্ণ নতুন একটা জগতে এসেছি মা। অন্তরের মা বলার চেষ্টা করল, কে বলেছে? তুই তো আমার পাশেই আছিস। কোথাও যাস নি তো। অন্তর হাঁসছে।

তার মা সবাইকে বলতে লাগল, অইযে আমার ছেলে বেঁচে আছে। ও মরে নি। ওইযে তাকিয়ে আছে। তোমরা এভাবে জীবিত ছেলেটাকে দাফন করো না। ওকে বের করো এখান থেকে। তার মা চিৎকার করে পাগলের মতো হয়ে গেল। অন্তরের বাবা তার স্ত্রীকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে আসল। অন্তরের জানাজা হবে এখন। চলে যাবে একটা দেহ মাটির নিচে। সাথে একটা ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন।

চলবে......